শিশুশিক্ষার গোড়াপত্তন

শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস

সে গুণে বললো ৪টি আছে। তখন শিক্ষক মহাশয় জিজ্ঞাসা করবেন, 'তোমাকে ক'টি কার্ড দেওয়া হয়েছিল? ৮টি, না? তার থেকে ৪টি সরিয়ে রাখার পর এখন ক'টি আছে? ছেলেটি তখন বললো ৪টি। তখন শিক্ষক মহাশয় জিজ্ঞাসা করবেন, তা হ'লে ৮ থেকে ৪ গেলে কত থাকে? এই ভাবে শিশুদের বিয়োগ শেখাতে হবে। তারপর নানা উপকরণের সাহায্যে শিশুদের ছোট ছোট বিয়োগ করতে দিতে হবে। যোগের মতই প্রথম দিকে হাতে না রেখে যে বিয়োগ করা যায়, সেই বিয়োগগুলি করতে দিতে হবে। বিয়োগ সম্পর্কে ধারণা একটু স্পষ্ট হলে, বিয়োগের চিহ্নটির (—) সাথে পরিচয় করাতে হবে। পাশাপাশি ও নীচে নীচে দু' ভাবে লিখেই বিয়োগ করাতে হবে। যেমন :—

৬—২=৪ ; অথবা ৬

$$\begin{array}{r} ৬ \\ -২ \\ \hline ৪ \end{array}$$

এই ধরনের অঙ্ক কষতে শিখলে সাম্‌স কার্ডের সাহায্য নিতে হবে। এই সময় শিশুরা যাতে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই অঙ্কগুলি কষতে পারে, তা দেখতে হবে। প্রয়োজন হলে তারা উপকরণের সাহায্যও নিতে পারে। ছেলেরা যাতে উপকরণের সাহায্য না নিয়েই অঙ্ক কষতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এক একটি কার্ডে ৫টির বেশী অঙ্ক দেওয়া উচিত নয়।

বিভিন্ন স্তরে কি ধরনের বিয়োগ দেওয়া উচিত, নীচে তার নমুনা দেওয়া গেল।

বিয়োগ কর ঃ—কত থেকে কত বাদ দিলে নীচের সংখ্যাটি পাওয়া যাবে ? কোন্ কোন্ সংখ্যার বিয়োগফল তিন হবে ?

৮—৫ = *	৮—* = ৩	*—* = ৩
৭—৪ = *	৬—* = ৩	*—* = ৩
৮—৫ = *	৯—* = ৩	*—* = ৩
৪—১ = *	৪—* = ৩	*—* = ৩
৫—২ = *	৫—* = ৩	*—* = ৩

এক একটি ধাপের অঙ্ক যখন শিশুরা সহজেই কষতে পারবে, তখন অন্য ধাপের অঙ্ক দিতে হবে। একই দিনে একাধিক ধাপের অঙ্ক দেওয়া উচিত নয়।

এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে যাওয়ার জন্য যেটুকু সময় লাগে, সে সময়টুকু দিতে হবে। কোন ক্ষেত্রেই তাড়াতাড়ি করলে চলবে না।

এর পর শিশুরা দশককের ঘরের বিয়োগ করবে, কিন্তু এখানেও হাতে রাখার অঙ্ক দেওয়া উচিত হবে না।

নীচে একটি সামস্ কার্ডের নমুনা দেওয়া গেল, 'দশককে'র সংখ্যা থেকে ধার না করেও এই অঙ্কগুলি কষা যাবে ঃ—

২৪—১১ = ?

১৬—১০ = ?

১৯—১৫ = ?

২১—১০ = ?

২৭—১৬ = ?

২৯—১৮ = ?

শিশু-শিক্ষার গোড়াপত্তন

শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস, এম. এ.,
নয়া-শিক্ষা, শারীরিক শিক্ষা, পুতুল, খেলার মেলা,
দেবতার গ্রাস প্রভৃতি পুস্তক প্রণেতা

পরিবেশক ঃ
আইডিয়্যাল পাবলিশার্স
১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
পরাণচন্দ্র মণ্ডল
১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর ঃ
হরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস,
২০, গৌরমোহন মুখার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট মুদ্রক ঃ
মোহন প্রেস,
২, করিসচার্চ লেন,
কলিকাতা-৯

বাঁধিয়েছেন ঃ
ব্যানার্জী এ্যাণ্ড কোং
১০১, বৈঠকখানা রোড,
কলিকাতা-৯

মূল্য ঃ তিন টাকা মাত্র

পূর্বাভাস

শিশু-শিক্ষার ব্যাপারটা সহজ নয়। অনেক গবেষণা আর ভাবনার কথা আছে এর পিছনে। পরিণত মনের দৃষ্টি-ভংগী দিয়ে ছোটদের মনকে বোঝা যায় না। রবীন্দ্রনাথও সে কথা বলেছেন। যে মাষ্টারের মন থেকে শৈশবের শিশুটা মারা গেছে, তার দ্বারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খবরদারির কাজ চলতে পারে, কিন্তু শিক্ষকতা হতে পারে না।

মনস্তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে কথাটা ভাবার দিন এসেছে। শিশু-শিক্ষার যত কিছু জটিলতা, যত কিছু অসুবিধা, তা সমস্যার আকারে দেখা দেয় প্রথম দুটি শ্রেণীতেই। এই কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম দুটি শ্রেণী-পঠনের কথা নিয়ে অনেক আলোচনা হ'য়েছে। কি ভাবে, কেমন করে, তাদের পড়াতে হ'বে, সে সম্পর্কে একাধিক পন্থা নিরূপিত হয়েছে।

শিশু-শিক্ষার গোড়াপত্তন যে বয়সে, সেই বয়সের মনস্তত্ত্বের কথা সর্বাগ্রেই চিন্তা করতে হবে। শিশু-শিক্ষাটা এমন সহজ স্বাভাবিক হওয়া উচিত যে, ছেলেরা যে 'লিখছে' 'শিখছে', 'জানছে', এটাই তারা টের পাবে না। অথচ লেখা পড়ার নেশা তাকে পেয়ে বসবে। 'থি্ আরস্' অর্থাৎ 'রিডিং' 'রাইটিং' এ্যাণ্ড 'এরিথ্মেটিক'-ই হবে সে শিক্ষার পরোক্ষ উদ্দেশ্য, প্রত্যক্ষ মাধ্যম হবে খেলা, কাজ ইত্যাদি।

প্রকাশক :
পরাণচন্দ্র মণ্ডল
১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
হরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস,
২০, গৌরমোহন মুখার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট মুদ্রক :
মোহন প্রেস,
২, করিসচার্চ লেন,
কলিকাতা-৯

বাঁধিয়েছেন :
ব্যানার্জী এ্যাণ্ড কোং
১০১, বৈঠকখানা রোড,
কলিকাতা-৯

মূল্য : তিন টাকা মাত্র

পূর্বাভাস

শিশু-শিক্ষার ব্যাপারটা সহজ নয়। অনেক গবেষণা আর ভাবনার কথা আছে এর পিছনে। পরিণত মনের দৃষ্টি-ভংগী দিয়ে ছোটদের মনকে বোঝা যায় না। রবীন্দ্রনাথও সে কথা বলেছেন। যে মাষ্টারের মন থেকে শৈশবের শিশুটা মারা গেছে, তার দ্বারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খবরদারির কাজ চলতে পারে, কিন্তু শিক্ষকতা হতে পারে না।

মনস্তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে কথাটা ভাবার দিন এসেছে। শিশু-শিক্ষার যত কিছু জটিলতা, যত কিছু অসুবিধা, তা সমস্যার আকারে দেখা দেয় প্রথম দুটি শ্রেণীতেই। এই কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম দুটি শ্রেণী-পঠনের কথা নিয়ে অনেক আলোচনা হ'য়েছে। কি ভাবে, কেমন করে, তাদের পড়াতে হ'বে, সে সম্পর্কে একাধিক পন্থা নিরূপিত হয়েছে।

শিশু-শিক্ষার গোড়াপত্তন যে বয়সে, সেই বয়সের মনস্তত্ত্বের কথা সর্বাগ্রেই চিন্তা করতে হবে। শিশু-শিক্ষাটা এমন সহজ স্বাভাবিক হওয়া উচিত যে, ছেলেরা যে 'লিখছে' 'শিখছে', 'জানছে', এটাই তারা টের পাবে না। অথচ লেখা পড়ার নেশা তাকে পেয়ে বসবে। 'থ্রি আরস্' অর্থাৎ 'রিডিং' 'রাইটিং' এ্যাণ্ড 'এরিথ্‌মেটিক'-ই হবে সে শিক্ষার পরোক্ষ উদ্দেশ্য, প্রত্যক্ষ মাধ্যম হবে খেলা, কাজ ইত্যাদি।

এই বিশেষ দৃষ্টি-ভংগীর পরিপ্রেক্ষিতে বইটি লেখা হয়েছে। প্রথম দুটি শ্রেণীতে পড়ানোর খুঁটি-নাটি তথ্য পরিবেশন এবং বিচিত্র উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করা যায়, পুস্তকটি শিশু-শিক্ষার কাজে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

এই পুস্তক রচনার পরিকল্পনা এবং তাগিদ এসেছিল বন্ধুবর শ্রীআলোক চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছ থেকে, তাই প্রথমেই তাঁকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এহেন গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে শ্রদ্ধেয় শ্রীপরাণচন্দ্র মণ্ডল মহাশয় আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁর ঋণ অশোধ্য।

পুস্তকটি যদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাজে লাগে, শিশু-শিক্ষার পথ যদি কিছুটা সুগম হয়, তবেই জানবো আমার শ্রম সার্থক হয়েছে। ইতি—

রাখীপূর্ণিমা, ১৩৬৫
১৮নং ক্রীক রো
কলিকাতা

লেখক

॥ পঠন-শিক্ষা ॥

…পড়াটা যেন জ্ঞানের পরিক্রমা। ভাবনা থেকে ভাবে যাওয়ার রাস্তার ধারে ধারে অক্ষরের মাইল ষ্টোনগুলো খাড়া হয়ে আছে। মন যখন সেগুলিকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়, তখন জ্ঞানের রাজ্য আসে চেনার মধ্যে। পড়া এসে পৌছায় পরিণতিতে।…

●

যে পড়তে পারে, তার চোখ-কান-মন খোলা। তার মালার সীমানা সুদূর প্রসারী। যে নিরক্ষর, চোখ থেকেও সে অন্ধ। তার চারদিকের সমস্ত পথই বন্ধ।

●

He who can read, has all literature open to him. He can make himself acquainted with the best thoughts of the best and wisest men. He has the key of all human knowledge in his possession.…

পড়ার অনুরাগটাই পঠন-শিক্ষার গোড়ার কথা। যাতে সেই ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে উঠে, পড়তে শেখার মনোভাব যাতে অভ্যাসে দাঁড়ায়, সেদিকে শিক্ষককে দৃষ্টি দিতে হবে। সত্যিকার পড়ার আগ্রহ জাগ্রত হওয়ার আগে, জোর করে কোন শিশুকে বই পড়াবার চেষ্টা করা ঠিক নয়। পাঁচ বছর বয়স পার না হতেই যে কোন রকমে হাতে খড়ি দিয়ে ছেলেদের বর্ণ পরিচয় করাতেই হবে, এমন নয়। প্রথমেই দেখতে হবে যে, শিশুর অনুরাগ থেকে বই পড়ার ইচ্ছা আসছে কিনা ; যেখানে তা' আসছে, সেখানে শিশুরা যে অতি সহজেই লেখা-পড়া শিখবে, তা' বুঝতে হবে। সেই সংগে শিক্ষককে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, পঠনটা শিশুর কাছে একটা 'thought getting process' অর্থাৎ পড়াটা শিশুর কাছে কেবল কতকগুলো শব্দ উচ্চারণ করা নয়, একটা চিন্তা-লেন-দেনের উপায়ও বটে। চোখ দিয়ে বই পড়ার সময় শিশুর মন চুপ করে থাকেনা, অর্থ অনুধাবনের সময় চিন্তা-কথা-ভাব মন থেকে মগজে গিয়ে পৌঁছায়।

দেখার ঔৎসুক্য আর জানার কৌতূহল থেকেই পড়ার আগ্রহ জন্মায়। পড়ে শুনে কিছু জানাটা যে কত আনন্দের, কত মজার ব্যাপার, যখনই শিশুরা তা টের পায়, তখন বই পড়ায় শিশুর আগ্রহ দেখে কে? কিছুতেই যেন বই পড়ায়

তাদের ক্লান্তি আসে না, চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে তাদের বিদ্যাবত্তা জাহির করতে চায়। কাজেই যে অনুরাগ শিশুদের মধ্যে এতখানি উন্মাদনা আনে, শিশুদের লেখা-পড়ার কথা ভাবতে গেলেই সে বিষয়ে চিন্তা করতে হবে। প্রথমেই জানতে হবে পড়ায় ছেলেদের অনুরাগ আছে কিনা ? যদি না থাকে, তবে কিরূপে তা সৃষ্টি করা যায়, সে কথাটাই ভাবতে হবে।

বই পড়ার প্রথম আগ্রহ আসে পরিবেশ থেকে। বাড়ীর অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেমেয়েরা যখন বই নিয়ে পড়তে বসে, তখন তাদের ছোট ভাই-বোনেরা বিড় বিড় করে দিদিদের অনুকরণে পড়ার ভান করে। কখনো ছবির বইয়ের পাতা উল্টায়, শ্লেটে হিজিবিজি কাটে, এমনি করে ভাই-বোনদের পড়তে দেখে তারও আগ্রহ জাগে। শিক্ষিত ঘরের ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার আগেই কিছু কিছু লিখতে পড়তে শেখে। ভাল ছবির বই, ছড়ার ছবি, কবিতার বই শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বড়দের কাছ থেকে নানান্ ধরণের গল্প শুনতে শুনতে বই থেকে সেই জানা গল্প পড়তে তাদের ইচ্ছে হয়। অপর পক্ষে দরিদ্র অশিক্ষিত ঘরের ছেলেমেয়েদের সে সুযোগ নেই বলেই তাদের পড়া শুনায় তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। শিশু-বিদ্যালয়ের সুসজ্জিত পরিবেশ, নানা চিত্র সমাবেশও শিশুদের বই পড়ার আগ্রহকে উদ্দীপ্ত করে তোলে।

এখন দেখা যাক, এই আগ্রহের উৎস কি ? পরিবেশ, **প্রেরণা, প্রভাব** এবং **প্রচেষ্টা**। পরিবেশের প্রভাব থেকে প্রেরণা এবং সেই প্রেরণা থেকে বই পড়ার প্রচেষ্টা চলে।

শিশুরা দেখে শুনে জানে, তারপর পড়তে আরম্ভ করে। বিদ্যালয় পরিবেশের নির্দেশাত্মক কথাগুলো—যেমন 'প্রবেশ নিষেধ', 'সাবধান', 'নীরবে'—যখন শিশুরা পড়তে এবং তার অর্থ বুঝতে শেখে, তখন ঐ কথাগুলোর পরিবর্তে ঐ ধরণের অন্য কি কথা ব্যবহার করা যেতে পারে বললেই শিশুরা মাথা ঘামিয়ে অন্য শব্দ চয়ন করতে শিখবে। ফলে তাদের শব্দ সম্পাদের চৌহদ্দি কিছুটা বেড়ে উঠবে, নতুন নতুন শব্দ সংগ্রহের আগ্রহও বাড়বে ; সংগে সংগে সেই পরিচিত কথাগুলি শিশুরা পড়তে ও লিখতে শিখবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষাবিদদের অভিমত এই যে, স্বাস্থ্য-সপ্তাহের পোষ্টারগুলো শিশুদের পড়ার আগ্রহকে শতগুণে বাড়িয়ে তোলে। তাই তাঁরা বলেছেন 'Interest in reading develops in Health-week activities.' স্বাস্থ্য-প্রদর্শনীর বিচিত্র ছবি সমন্বিত বিজ্ঞাপন আর পোষ্টার-গুলো শিশুদের মনে এত প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে যে, কৌতূহলে উদ্দীপ্ত হয়ে শিশুরা ঘুরে ঘুরে সেগুলি দেখে আর পর পর ছবির নীচের লেখাগুলো পড়তে আরম্ভ করে।

ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার কথাই শিশুরা শুনতে ভালবাসে। সেই কাজের কথা থেকেই শিশুরা পড়া আরম্ভ করে। গান্ধীজীও সে কথা বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি বলেছিলেন যে, শিশুরা যখন উৎপাদনক্ষম হয়ে উঠবে, তখনই সত্যি করে তার লেখা-পড়া শুরু হবে। এটা পড়ার মনস্তত্ত্বের কথা। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকরাও তাই বলেছেন যে, The child's earliest reading experiences in school are closely

connected with his activities. অর্থাৎ শিশুদের কোন একটা সৃজনাত্মক কাজকে কেন্দ্র করে অতি সহজেই তাদের লিখন পঠন শিক্ষা দেওয়া যায়। যেমন ধরা যাক্, ছেলেরা রং তুলি দিয়ে কতকগুলো ছবি এঁকেছে ; কাজের শেষে শ্রেণী কক্ষের এক কোণে সরঞ্জামগুলো গুছিয়ে রাখতে হবে ; সেখানে এসে তারা দেখলো দেওয়ালের গায়ে র‍্যাকের উপরে অনেকগুলি নির্দেশ লেখা রয়েছে ঃ

'তুলিগুলো ভাল করে ধুয়ে রাখো',
'নীচের তাকে রংগুলো রাখো',
'অগোছালো করো না',
'ছবিগুলো গুছিয়ে রাখো।'

প্রতিদিন সেইগুলো পড়ে তার নির্দেশ মত শিশুদের কাজ করতে হয়। দেওয়ালের কোনখানে কি লেখা আছে, কখন কি করতে হবে, কাজের শেষে সেই নির্দেশগুলো না পড়লে যে শিশুদের চলে না, কারণ সেই মতই যে তাদের কাজ করতে হবে। শুধু তাই নয়, কাজ শেষ হলে কেমন করে কি করেছে, কি ভাবে কি এঁকেছে, সে কথাও যে শিশুদের খাতায় লিখে শিক্ষক-মহাশয়কে পড়ে শোনাতে হয়। এমনি করে অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে শিশুর পঠন শিক্ষা চলতে থাকে।

এখানে প্রশ্ন উঠছে যে, শিশুরা কি একেবারে নীচু শ্রেণীতে বই পড়বে না ? কাজ থেকে, অভিজ্ঞতা থেকে যে সব কথা আসবে, যে শব্দের সংগে তার পরিচয় হবে, কেবল কি সেই কথাগুলোই শিশুরা লিখবে, পড়বে ? প্রশ্নটা কিন্তু তা নয়।

পড়ার আগ্রহ জাগলে, শিশুদের তরফ থেকে তাগিদ এলে, অবশ্যই তাদের কোন না কোন পড়ার বই দিতে হবে। তবে দেখতে হবে যে, সে বইয়ে যেন থাকে—(ক) শিশুর জানা ছড়া (খ) তার অভিজ্ঞতার কথা (গ) পরিচিত শব্দ (ক) এবং জানা কাহিনী।

এছাড়া পড়ার খেলার জন্য ফিল্মের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সন্ধ্যার সময় ছেলেদের সভায় ছবি দেখানোর যে, ব্যবস্থা করা হবে, সেই ছবির নীচেকার লেখাগুলো পড়ে কোন একটি ছেলে অন্যদের বুঝিয়ে দেবে। ছবিগুলো যখন পর্দায় দেখানো হবে, তখন পর্দার এক পাশে দাঁড়িয়ে ছেলেটি পড়ে যাবে : দেখ, ছেলেরা কী আনন্দে চড়ুই ভাতি করছে। কেউ আনছে কাঠ, কেউ কুটছে মাছ, কেউবা পেয়ারা গাছে উঠে ডাল ভাঙছে। আজ ওদের কি মজার দিন! এমনি করে পালাক্রমে ছেলের ছবি দেখানোর সংগে একে একে সেগুলি পড়ে যাবে। যারা নির্ভুল ভাবে পড়তে পারবে, তাদেরই সেই সুযোগ দেওয়া হবে। এই কথাটা শিশুদের জানিয়ে দিয়ে প্রত্যেককেই উৎসাহ দিয়ে বলতে হবে যে, কাল সন্তুর সিনেমা পরিচালনার কাজটি কিন্তু ভারী সুন্দর হয়েছিল, আশা করি চেষ্টা করলে তোমরা প্রত্যেকেই সন্তুর মত করেই পড়ে পড়ে সকলকে বুঝিয়ে দিতে পারবে, অবশ্য সেজন্য দস্তুর-মত করে পড়ার অভ্যাস করতে হবে। চেষ্টা না করলে কি কিছু হয়, কি বলো?

গল্প বলার পর, আসবে পড়ার কথা। সেজন্য গল্পের

প্ল্যাকেট লাগাতে হবে ছেলেদের গায়ে। ধরা যাক—'তিনটি পরীর' গল্প ছেলেদের পড়তে দেওয়া হয়েছিল, ছেলেদের অনেকেই মনে মনে পড়তে আরম্ভ করেছে। তখন শিক্ষক মহাশয় ছেলেদের মধ্যে থেকে তিন জনকে ডেকে এনে তাদের গায়ে বিভিন্ন পরীর নাম লেখা প্ল্যাকেটগুলো আটকে দিয়ে ছেলেদের বলবেন, এই দেখ, তোমাদের সামনে গল্পের তিনটি পরীই এসে দাঁড়িয়েছে। প্রথমেই আছে লাল পরী, তারপর নীল পরী আর সবশেষে এসেছে ফুল পরী। এদের গল্প পড়বে তোমরা, বেশ আমি ওদের নাম লিখে নিচ্ছি। একথার পর শিক্ষক মহাশয় বোর্ডে লিখে দেবেন ঃ

লাল পরী, নীল পরী আর ফুল পরী—এই নিয়ে পরীর সংসার ইত্যাদি।

তারপর শিক্ষক মহাশয় বলবেন—তা হলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে, তিন জন পরীই তোমাদের সামনে এসে হাজির হয়েছে। ওদের সংগে পরে আলাপ করা যাবে; এবার বই থেকে পড়ে শুনিয়ে দাও তো অন্তু, পরীদের কথা কি লেখা আছে। অমনি অন্তু বই খুলে পড়তে আরম্ভ করবে। তখন পড়তে তার বোধ হয় আর কোন অসুবিধা হবে না; কারণ ইতিমধ্যেই বোর্ডের কথাগুলোর সংগে বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছে সে। কাজেই পরিচিত কথাগুলো সে বেশ স্বচ্ছন্দে পড়ে ফেলবে। এই ভাবে ছেলেদের পড়ার অভ্যাসটি কায়েম হতে থাকবে। এই সব গল্পের বইয়ের প্রথমেই থাকবে—ছন্দের ঝংকার। যেমন ঃ

ফুলের বাসে চাঁদের দেশে আলোর সুধা লুটি—
আমরা আসি স্বপ্নে হাসি ঘুমের দেশে জুটি।
সবার চোখে ঘুমের কাজল আমরা এঁকে যাই,
তিনটি পরীর রূপে গুণের তুলনা আর নাই।

ছন্দোবদ্ধ গল্পের এই ভূমিকাটুকু ছেলেরা বার বার আবৃত্তি করে আনন্দ পাবে এবং এক নিঃশ্বাসে গল্পের শেষটুকু পড়ে ফেলবার ইচ্ছে হবে। এমনি করে ছেলেদের মধ্যে বই পড়ার অনুরাগ জন্মাবে।

পঠন অনুরাগ জন্মালেই যে সকলেই ভাল ভাবে পড়তে শিখবে, তার কোন মানে নেই। এই না পড়তে পারার পিছনে যে সব কারণ রয়েছে, তার কোন একটার ব্যতিক্রম ঘটলে পড়ার সময় শিশুদের ভুল হবেই। ভালভাবে পড়তে পারাটা কিছুটা অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। কাজেই সে অনুশীলনের সংগে প্রয়োজন :—

১। কথার অর্থগত সামগ্রিকরূপে পড়া (Reading by the thought unit)

২। দ্রুত এবং নির্ভুল শব্দ পরিচিতি (accurate and speedy word recognition)

৩। সঠিক দৃষ্টি পরিচালনা (proper eye movements)

৪। শব্দ পরিচিতির ব্যাপকতা (a wide recognition span)।

ভালভাবে পড়তে পারার প্রধান কথা হচ্ছে দ্রুত এবং

নির্ভুল শব্দ পরিচিতি। যাতে প্রথম থেকে এদিকে শিশুর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, তা দেখতে হবে। আর লক্ষ্য রাখতে হবে শিশুরা যাতে থিকিয়ে থিকিয়ে না পড়ে।

এই দ্রুত শব্দ পরিচিতির জন্য **'ফ্ল্যাস কার্ডে'র** ব্যবস্থা করা যেতে পারে। লম্বা ধরণের অনেকগুলো কার্ডে নানা রকম কথা বড় বড় ছাপার হরফে লেখা থাকবে। শিক্ষক মহাশয় হঠাৎ যার সামনে সেই কার্ডটি তুলে ধরবেন, কার্ডে কি লেখা আছে তৎক্ষণাৎ তাকে তা' পড়তে হবে। কার্ডগুলো অবশ্য শিশুর চোখের দৃষ্টির সমান্তরাল রেখায় তুলে ধরতে হবে; তার বাইরে বা একেবারে নিকটে হলে, ছেলেদের পড়তে অসুবিধা হতে পারে। 'ফ্ল্যাস কার্ডে'র কথাগুলো পড়তে শিশুদের কম বা/বেশী সময় লাগতে পারে। তা যা হোক, 'ফ্ল্যাস কার্ড' থেকে হঠাৎ বাক্যাংশগুলি পড়ার অভ্যাস করলে, অল্পদিনেই শিশুরা এক নজরে বাক্যাংশের সবটুকু পড়তে শিখবে। তাদের শব্দ পরিচিতির দৃষ্টিও ব্যাপক এবং প্রসারিত হবে।

শব্দ পরিচিতির সময় বৈসাদৃশ্য জ্ঞানই শিশুদের মনে প্রথম আসে। সৌসাদৃশ্যের ধারণা আসে তার অনেক পরে। বিচিত্র বা বিদ্‌ঘুটে ধরণের কথাগুলিই শিশুরা সহজেই মনে রাখতে পারে। কারণ সে শব্দগুলি শিশুদের মনে স্পষ্ট রেখাপাত করে। যেমন 'লাঞ্ছিত', 'ব্যাঙাচি', 'কুপোকাৎ', 'মিশ কালো', 'ধব্‌ ধবে সাদা' প্রভৃতি কথাগুলো মনে রাখতে শিশুদের বিশেষ বেগ পেতে হয় না; কিন্তু ধ্বনি বা শব্দগত মিল কথা-গুলো—যেমন 'নীল', 'নল', 'হরু', 'হারু', 'রুণু', 'রাণু',—

শিশুদের মনে বিভ্রান্তি আনে ; কথাগুলো নিয়ে তারা কেমন যেন গোলমালে পড়ে। ঐ ধরণের কথাগুলো মনে রাখার সহজ উপায় ছড়ার ছন্দে তাদের রূপ দেওয়া। যেমনঃ—

ঝণ্টু, ঝানু, রুণু ছানু ;
হরু, হারু, রুণু, রাণু।

পিছিয়ে-পড়া ছেলেদের নিয়মিত মহড়া ঃ

পড়ায় বিশেষ ভাবে পিছিয়ে-পড়া ছেলেদের ব্যক্তিগত সাহায্যের প্রয়োজন হবে। পঠন অভ্যাসের জন্য নিয়মিত 'ড্রিলিং'এর দরকার। আংগিকগত কোন দোষ ত্রুটি না থাকলে, ব্যক্তিগত সাহায্য ও নিয়মিত মহড়ার দ্বারা ছেলেদের সাধারণ পঠন অসুবিধাগুলো সহজেই দূর করা যেতে পারে। ছেলেদের কাছে শিক্ষক যদি আত্মভোলা এবং অভাবুক হন, তা হলে শ্রেণীতে তাঁর দীর্ঘ উপস্থিতি ছেলেদের কাছে বিরক্তিকর হতে পারে ; সে ক্ষেত্রে পঠন শিক্ষায় ছেলেরা আদৌ প্রেরণা নাও পেতে পারে। ছেলেদের কাছে শিক্ষককে সব সময় জীবন্ত ও আদর্শ হতে হবে, তা না হলে তাঁর কথাগুলো শিশুদের মনে স্থায়ী রেখাপাত করবে না। অনেক শব্দ আছে যেগুলির চিরস্থায়ী ছবি শিশুদের মনে আঁকা থেকে যায়। সেগুলির মধ্যে ধ্বনিগত, অর্থগত সামঞ্জস্য আবিষ্কার করে শিশুরা যথেষ্ট আনন্দ পায়, তাদের কৌতূহল জাগ্রত হয়ে উঠে। যেমন 'রুণু ঝুণু', 'ঝম্ ঝম্', 'কড় কড়' ইত্যাদি। ইংরাজী ভাষায় ঐ ধরণের ধ্বনিগত সাদৃশ্য বিদ্যমান শব্দও আছে প্রচুর। যথা—

Hark, hark, the dogs do dark. বাংলাতেও ঐ ধরণের কথার আমদানী করা যেতে পারে। যেমন :—

গাছে গাছে ফিঙে নাচে নাচে কিবা রে,
আলোর স্রোতে চারিভিতে স্বর্ণ বিভা রে !

অনুপ্রাস সমৃদ্ধ সমিল ছন্দও শিশুদের কাণে ঝংকার তোলে। সেই ধরণের সমিল কথাগুলো শিশুমাত্রই সাগ্রহে পড়তে চায় ; কথাগুলো পড়তে তাদের মজা লাগে, কাজেই সেই শ্রুতি-সুখ-কর কথাগুলো ছেলেরা আরো অন্যান্য বই থেকে খুঁজে বার করতে চায়, তখনই তাদের সত্যিকার পড়ার মনোভাব জাগ্রত হয়ে উঠে। ঐ ধরণের অনুপ্রাসযুক্ত বিস্তর কথা ইংরাজী ভাষায় রয়েছে। যেমন :—

Five fat followers fishing in February
Fell into the fast flowing flood.
Four foxes found fifty fat feathery fowls
Fred, fix those foxes, said father.

বাংলাতেও ঐ ধরণের শব্দ সৃষ্টি করা যেতে পারে। যথা :—

ফকির সেজে ফটিক যখন এলো ফরিদপুরে—
ফল্গু কাকা ফড়িং মামা চিনলো মুসাফিরে।

এই ধরণের কথা দিয়ে অর্থহীন শব্দ সমন্বয়ে ছেলেদের মজাদার ছড়ার বই তৈরী করা যেতে পারে। সে বইটি হবে একান্ত ভাবে আবৃত্তি আর সরব পাঠের জন্য।

পিছিয়ে-পড়া শিশুর পঠন শিক্ষা ঃ

লেখাপড়ায় পিছিয়ে-পড়া ছেলেদের পড়তে শেখানোটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। সাধারণ বুদ্ধির ছেলেরা যে বিষয় চট্ করে শিখতে পারে, সে বিষয় আয়ত্ত করতে পিছিয়ে-পড়া ছেলেদের বহু সময় লাগে। অনেক ক্ষেত্রে দশগুণ সময়ের প্রয়োজন হয়। এই কারণে সাধারণ (স্বাভাবিক) ছেলেদের সঙ্গে তাদের শিক্ষানুশীলন চলতে পারে না। সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থায় পিছিয়ে-পড়া ছেলেরা কখনই উপকৃত হতে পারে না। তাদের জন্য ব্যক্তিগত এবং বিশেষ অনুশীলনের প্রয়োজন হয়।

পঠন-প্রগতি-পত্র থেকে পিছিয়ে-পড়া ছাত্রদের প্রকৃতি ও ধরণ জানা যায়। পিছিয়ে-পড়ার তু'টি কারণ আছে। এক মানসিক ত্রুটি ; দ্বিতীয় দৈহিক বা আঙ্গিক বিকৃতি। পিছিয়ে-পড়া ছেলেদের মোটামুটি পাঁচটি ভাগে ভাগ করা চলে, যথা—

১। জড়ধী—বুদ্ধির পরিমাপে যাদের আই-কিউ ২৫-এর নীচে। তাদের একেবারে অপদার্থ বলা চলে, তাদের দ্বারা লেখা-পড়া তো দূরের কথা, অন্য কোন কাজকর্ম করানোও সম্ভবপর নয়। এমন কি তাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিতে হয় অন্যকে। কাজেই তাদের জন্য কোনরূপ পঠন-শিক্ষার অনুশীলন চলতেই পারে না।

২। দ্বিতীয় পর্যায়ের বিকৃত-মনা শিশুদের বলে **ইম্‌বেসাইল**। তাদের আই-কিউ হচ্ছে ৫৯। তারাও প্রায় কাজের অনুপযুক্ত। এই ধরণের শিশুদের লেখা-পড়া শেখানো সম্ভবপর নয়।

৩। তৃতীয় পর্যায়ের বিকৃত-ধী শিশুদের বলে **ব্যাধিত বা বিষণ্ণমনা** শিশু। এদের আই-কিউ* ৬৯। এদের দ্বারা শিল্পাদি কাজ করানো যায়। দীর্ঘদিনের অনুশীলনের পর এদের মধ্যে কেউ কেউ কিছু কিছু পড়তে পারে। এদের স্মরণ শক্তি এতই ক্ষীণ যে, এরা শেষ পর্যন্ত প্রায় সব জিনিষই ভুলে যায়। জ্ঞানতঃ কিছুই যেন মনে রাখতে পারে না।

৪। চতুর্থ পর্যায়ের শিশুদের বলা হয় **সীমান্তবর্তী শিশু**। অর্থাৎ যারা ভোঁতা ও স্বাভাবিক বুদ্ধির ঠিক মাঝামাঝি পর্যায়ে পড়ে। এই শিশুদের বৃত্তি শিক্ষার কাজ, শিল্প-কর্ম, শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। এদের দ্বারা রুটিন মাফিক লেখা-পড়ার কোন কাজ চলতে পারে না।

৫। পঞ্চম পর্যায়ের শিশুদের বলে **মোটা বুদ্ধির শিশু**। এদের আই-কিউ হ'চ্ছে ৮৯। এদের দ্বারা শিল্প ও বৃত্তি শিক্ষার কাজ ভালোভাবে চলতে পারে। সযত্ন অনুশীলনের দ্বারা এদের একটু আধটু লেখাপড়া শেখানোও যায়। ব্যক্তিগত-শিক্ষণ-ব্যবস্থার দ্বারা (Individual teaching) লেখাপড়ার প্রতি এদের আগ্রহ সৃষ্টি করাটা কঠিন নয়। তার জন্য প্রয়োজন অসীম ধৈর্য, অদমিত উৎসাহ এবং পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের ব্যবস্থা। পিছিয়ে-পড়া ছেলেদের জন্য ব্যক্তিগত যত্ন এবং বিশেষ শ্রেণীর প্রয়োজন।

---

* শিশুদের প্রকৃত বয়সকে মানসিক বয়স দিয়ে ভাগ দিলে যে বুদ্ধির পরিমাপ পাওয়া যায় তাকে আই-কিউ বলে।

এই ধরণের ছেলের পঠন-প্রস্তুতির জন্য নিম্নলিখিত অনুশীলনের বিশেষ দরকার :—

১। **আচরণ শিক্ষা (Habit Training)** : জড়ধী থেকে মোটা বুদ্ধির যত পিছিয়ে-পড়া ছেলে আছে তাদের সরাসরি লেখাপড়া শেখানো যায় না। তাদের জন্য একাধিক বিশেষ অনুশীলনের ব্যবস্থা আছে। শিশুদের ব্যক্তি-সচেতনতার জন্য প্রয়োজন অভ্যাস-সংগঠনের বা আচরণ শিক্ষার। সেগুলি যথাক্রমে হচ্ছে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতাবোধ স্বাস্থ্যকর অভ্যাস, প্রসাধনের অভ্যাস, খাদ্য গ্রহণের রীতি প্রভৃতি।

২। **সামাজিক অভিজ্ঞতা** : এই অভ্যাস গঠনের জন্য বিশেষ আলোচনা, ব্যক্তিগত ও সমাজগত সু-ব্যবহারের প্রয়োজন। মাতা-পিতা সহপাঠি, প্রতিবেশি এবং দর্শকের প্রতি ভালো ব্যবহার করতে শেখাতে হবে।

৩। **অনুভূতির শিক্ষা (Sense training)** : অনুভূতি-শিক্ষা অন্তর্গত হ'চ্ছে সাথীদের নাম মনে রাখা, রং চেনা, বিভিন্ন আকৃতির জিনিষের মধ্যে সাদৃশ্য কোথায় তা ঠিক করা। এছাড়া শব্দ-স্পর্শ ঘ্রাণ ও স্বাদের প্রকারভেদ নির্ণয় করা প্রভৃতি শিক্ষা দিতে হবে।

৪। **বাচনিক শিক্ষা (Speech training)** : বাচন ক্ষমতাকে শিক্ষাবিদরা সমাজ-পরিচিতির ভূমিকা বলে অভিহিত করেছেন। একে অনেকে বলেছেন যে, ভাষাটা হচ্ছে আত্ম-প্রকাশের নজিরপত্র। কাজেই যাদের ভাষা প্রকাশের অক্ষমতা আছে, অথবা যারা ঠিক কথা কইতে

পারে না, ভাঙা ভাঙা শব্দ উচ্চারণ করে, অথবা তোত্‌লামির জন্য কথা আটকে যায়, নিয়মিত আবৃত্তি, অথবা বাচনিক অনুশীলনের দ্বারা সর্বাগ্রে তাদের সেই ভাষাগত ত্রুটিগুলি দূর করতে হবে। তার আগে তাদের কোনরূপ পঠন শিক্ষা দেওয়া সম্ভবপর হবে না।

৫। **পৈশিক সহযোগিতা** (Muscular Co-ordination) : পৈশিক ক্ষমতা ও সহযোগিতার জন্য দরকার ছান্দিক ব্যায়াম, নৃত্য, কুচকাওয়াজ, খেলাধূলা প্রভৃতি। শিশু-দেহের ভারসাম্য রক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত তারা কোন কিছুই শিখতে পারে না।

৬। **প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ** (Nature Study) : প্রাকৃতিক পরিবেশ-পরিচিতির মধ্যে শিশুদের দর্শন, শ্রবণ এবং স্পর্শানুভূতি সজাগ হয়ে উঠে। যেগুলি পরবর্তীকালে তাদের লেখাপড়ার কাজে লাগানো সহজ সাধ্য হয়।

(৭) **কায়িক অনুশীলন** (Manual training) : কায়িক শ্রমের নানারূপ কাজ ছেলেদের দিয়ে করানো যেতে পারে। যেমন কাঠে পেরেক ঠোকা, কাঁচি দিয়ে কাগজ কাটা, সেলাইয়ের কাজ, ব্যবহার্য দ্রব্যাদি বয়ে নিয়ে যাওয়া প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে শিশুদের পৈশিক ও মানসিক শিক্ষা এক সঙ্গে চলতে পারে।

(৮) **প্রাক্ পঠন ক্রিয়াকলাপ** : পূর্ব বর্ণিত সমস্ত ক্রিয়াকলাপই প্রাক্ পঠন-প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজন। যতক্ষণ না শিশুদের স্বাধীন চিন্তাশক্তি, ভাব প্রকাশের ক্ষমতা, দৃষ্টিশক্তির

প্রসারতা এবং কান শিক্ষিত হয়, ততক্ষণ ছেলেদের কোন কিছু শেখানোই সম্ভব নয়।

এবার পঠন-শিক্ষার জন্য করণীয় কি, সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক। পিছিয়ে-পড়া শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার সময় সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, পঠন-শিক্ষায় তাদের প্রগতি অত্যন্ত ধীর মন্থর। কাজেই যাতে তাদের আগ্রহ এবং অনুরাগ বৃদ্ধি পায়, সেই ধরণের নানা প্রকার খেলাধূলা ও কাজের আমদানী করতে হবে। ছেলেদের এমন কাজ দিতে হবে যে, যার দ্বারা তারা উপকৃত হতে পারে। যা তাদের ক্ষমতার বাইরে, কখনই সে ধরণের কোন কাজ তাদের দেওয়া উচিত নয়। নিম্নলিখিত ক্রিয়াকলাপগুলিকে প্রাক্ পঠনশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, যথা :—

(১) কাজে নিযুক্ত করার বিচিত্র খবরাখবর (Occupational information)

(২) বৃত্তি-শিক্ষার নির্দেশিকা (Vocational guidance)

(৩) বৃত্তি-শিক্ষা (Vocational training)

(৪) বৃত্তি-শিক্ষামূলক কাজের উপস্থাপন (Vocational placement)

(৫) সমাজ-শিক্ষামূলক কাজের উপস্থাপন (Social placement)

উপরের অঙ্কে ছেলেরা পোক্ত হলে, পরের পর্যায়ে ছোট ছোট হাতে রাখা বা ধার করা বিয়োগ করাতে হবে। নীচে তার নমুনা দেওয়া গেল :—

১২—৬=৬
১৭—৯=৮

```
  ১২
 —৮
 ----
   ৪
```

১৩—৬=৭
১৪—৬=৮

```
  ১৪
 —৭
 ----
   ৭
```

উপরে অঙ্ক থেকে ধার করা রীতিটি ভালো ভাবে বুঝা যাবে। উপরের 'এককে'র ঘরে ২ আছে, কাজেই ২ থেকে ৬ বাদ দেওয়া যায় না; কাজেই দশককের ঘর থেকে ১ ধার করতে হবে, তা হলে সংখ্যাটি দাঁড়াবে ১২; এখন ১২ থেকে ৬ বিয়োগ করলে বাকী থাকবে ৬।

ক্রমশঃ কঠিন থেকে অপেক্ষাকৃত কঠিন অঙ্ক দিতে হবে, যেমন—

```
  ২৪          ২২
 —১৬         —১৮
 -----        -----
   ৮            ৪ ইত্যাদি।
```

এর পর আসে 'শতক'কের ঘরের বিয়োগের কথা। এই ধাপে আসার আগে ১০ দশে যে ১০০ হয়, সেটা একটু ঝালিয়ে নিতে হবে। এই সময় শূন্য '০' সংখ্যাটির ব্যবহারও শিশুদের ভালো করে শেখাতে হবে। সংখ্যার ডান দিকে '০' শূন্যের মূল্য আছে; কিন্তু বাঁ দিকে '০' বসলে শূন্যের কোনই মূল্য থাকে না, যেমন—১০ দশ, ০১ এক।

গুণ

গুণ জিনিষটা প্রকারান্তরে যোগেরই রূপান্তর মাত্র। একই সংখ্যা বার বার লিখে যোগ করতে অনেক জায়গা লাগে, তাই একই সংখ্যা একাধিকবার যোগ করার পরিবর্তে গুণের প্রবর্তন করা হয়েছে। শিশুদের উদাহরণ দিয়ে এই কথাটা বুঝিয়ে দিতে হবে।

যেমন :— (ক)

$$\begin{array}{r} ৪ \\ ৪ \\ ৪ \\ ৪ \\ \hline ১৬ \end{array}$$

(খ)

$$\begin{array}{r} ৪ \\ \times ৪ \\ \hline ১৬ \end{array}$$

চারটি '৪'কে পাশাপাশি বা নীচে নীচে রেখে যোগ করলে, তার যোগফল দাঁড়ায় ১৬ ; এই ১৬-র মধ্যে চারটি ৪ আছে। কাজেই চার ৪ বার যোগ না করে ৪ × ৪ গুণ করলে একই ফল পাওয়া যাবে। একই সংখ্যার 'যোগ'কে সোজা ভাবে বা তাড়াতাড়ি করার প্রণালীকে আমরা গুণ বলি।

৪ + ৪ + ৪ ; ২ + ২ + ২ + ২ ইত্যাদি এই ধরণের যোগগুলি শিশুরা যখন ভালোভাবে করতে পারবে, তখনই গুণের ধারণা দিতে হবে।

এখন দেখা যাক, কি ভাবে শিশুদের প্রথম গুণের ধারণা দেওয়া সম্ভব। প্রথম দিকে গুণ না পারলে ২ + ২ + ২ + ২ = ৮, ৩ + ৩ + ৩ = ৯ ইত্যাদি ধরণের একই সংখ্যার যোগ করাতে

শিক্ষণ-পদ্ধতি ঃ

এই তো গেল প্রাক্-পঠন প্রস্তুতির কথা। এবার বিশেষ শিক্ষণ-পদ্ধতির কথা অবতারণা করা যাক। পিছিয়ে-পড়া শিশুদের পঠনশিক্ষা দেওয়ার আগে ভালোভাবে শিশুদের জানতে হবে। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কেও জানা দরকার, তা না হ'লে ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুসারে সঠিকভাবে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে না। মানসিক ত্রুটি ছাড়াও শিশুদের মধ্যে অনেক আচরণ সমস্যা দেখা যায়। সাধারণ শ্রেণী-শিক্ষার দৈনন্দিন কার্যসূচীর আওতায় এই ধরণের শিশুদের আনা যায় না। তার কারণ এই ধরণের শিশুদের বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি, মনোযোগ, বিচারশক্তি, গ্রহণ-ক্ষমতা এতই কম যে, সাধারণ শিশুদের সঙ্গে তারা কখনই সমতা রেখে চলতে পারে না। সাধারণ শ্রেণী-পঠনে এই ধরণে শিশুদের মানসিক ক্ষতি এবং স্বাভাবিক শিশুদের পঠন-প্রগতি ব্যাহত হতে পারে। তারা যাতে কোনক্রমে হীনমন্যতায় আত্ম-বিশ্বাস না হারায়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে মন্তেসরি শিক্ষা-পদ্ধতি বিশেষ কার্যকরী বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

পরীক্ষার দ্বারা জানা গেছে যে, জড়ধী থেকে মোটা-বুদ্ধি পর্যায়ের যত শিশু আছে, তাদের ঠিক লেখাপড়া শেখানো যায় না, তবে আচরণ ও মনোভাবের উন্নতি সাধন করা যায়। ব্যক্তিগত ক্ষমতার বিভিন্নতা অনুসারে যে স্বাতন্ত্র্যতা দেখা যায়, তা আজও আছে এবং চিরদিন থাকবে।

সাধারণ পিছিয়ে পড়া শিশু : সাধারণ পিছিয়ে পড়া শিশুদের তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়—

১। যাদের সঠিক শব্দ পরিচিত হয়নি।

২। পড়ার সময় যাদের কথা বাদ পড়ে যায় অথবা থিকিয়ে থিকিয়ে পড়ে।

৩। অমনোযোগিতার জন্য যারা ঠিক দৃষ্টি পরিচালনা করতে পারে না। ব্যক্তিগত বিশেষ অনুশীলনের দ্বারা এই ধরণের ত্রুটিগুলি সহজেই দূর করা যায়।

পঠন প্রগতি-পত্রের ফলাফল অনুসারে প্রথমেই সাধারণ পিছিয়ে পড়া শিশুদের শ্রেণী-বিভাগ করে দেওয়া দরকার। ঠিকমত শ্রেণী-বিভাগ করা হ'লে তাদের আলাদা করে পৃথক পৃথকভাবে শিক্ষাদানের বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, শিক্ষায় তাদের আগ্রহ এবং অনুরাগ সব সময় বজায় থাকছে কিনা ; কোন পদ্ধতিতে তারা কতটুকু উপকৃত হ'চ্ছে। তাদের নির্ভুল ও সঠিক পঠন-প্রগতিপত্র রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। উল্লিখিত তিনটি পর্যায়ের শিশুদের পঠন-শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ার প্রধান কারণগুলি হ'চ্ছে যথাক্রমে (ক) অমনোযোগিতা, আত্ম-বিশ্বাসের অভাব, (খ) দুর্বল স্মৃতি, বোঝার দোষ, গ্রহণের অক্ষমতা এবং (গ) শব্দ পরিচিতি কম প্রভৃতি।

এই তিন পর্যায়ের শিশুদের জন্য পৃথক তিনটি প্রগতিপত্র রাখতে হবে। তাদের পঠন-শিক্ষা দেওয়ার সময় নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হতে পারে :—

১। সহানুভূতিশীল ব্যবহারের দ্বারা শিশুদের মন থেকে হীনমন্যতার ভাব দূর করে, তাদের মনে আত্ম-বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে।

২। যে যে শব্দ-পরিচিতি হয় নি, তোত্‌লামির জন্য যে যে কথা আটকে যায়, যে সব কথা বাদ পড়ে, বার বার অনুশীলনের দ্বারা সেগুলি যাতে ছেলেদের আয়ত্তাধীনে আসে, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

৩। ধিকিয়ে পড়ার অভ্যাস দূর করার জন্য আদর্শ পাঠ দানের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষক মহাশয় অনেকটা আবৃত্তি করানোর মত করে তাদের বিভিন্ন বিষয়, (বিশেষ করে সহজ সরল গদ্যাংশ এবং ধ্বনি প্রধান কবিতা তালে তালে) পড়াবেন।

৪। ফ্ল্যাস কার্ডের ব্যবহারের দ্বারা ছেলেদের সঠিক দৃষ্টি-পরিচালনা শিক্ষা দিতে হবে।

৫। পঠন উপকরণ হিসাবে বিচিত্র ছবির বই, কাটা অক্ষর দিয়ে শব্দ রচনার খেলা, বিপরীত শব্দ নির্ণয়, যুক্তাক্ষরের সঠিক ব্যবহার প্ল্যাকেট, চার্ট প্রভৃতি ব্যবহার করলে, সুফল পাওয়া যেতে পারে।

৬। মনোযোগ বাড়ানোর জন্য ক্রমপর্যায়ে বড় থেকে ছোট অক্ষর সাজানো চার্টের ব্যবহার করতে হবে। অথবা কোন বৃত্তের নির্দিষ্ট কেন্দ্র বিন্দুতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার খেলার আমদানীও করা যেতে পারে।

৭। পিছিয়ে পড়া শিশুদের কিছু শেখানোর সবচেয়ে

বড় কথা হ'চ্ছে শিক্ষকের সুগভীর সহানুভূতি এবং অসীম ধৈর্য—এ দুটির একটির অভাব ঘটলে কোন পদ্ধতিই কার্যকরী হবে না।

এখন পঠনের স্তর-ভেদের কথা আলোচনা করা যাক। পঠনকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় যথা :—

১। নীরব পঠন আর ২। সরব পঠন।

প্রথমটি উচ্চস্বরে, আর দ্বিতীয়টি হ'চ্ছে মনে মনে নিঃশব্দে পড়া। সরব পঠনটাই শিশুদের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। শব্দের ঝংকার শিশুদের কানকে আনন্দ দেয়, তাই শব্দের ধ্বনি যতক্ষণ না কান দিয়ে শিশুর মর্মে প্রবেশ করে, ততক্ষণ যেন বই পড়ে শিশুরা কিছুতেই স্বস্তি পায় না। এই জন্যে শিশুদের ক্ষেত্রে সরব পাঠের প্রয়োজন আছে। নীরব পঠনের প্রয়োজন শিশুর মনোসংযোগকে আকর্ষণ করবার জন্য। কিন্তু বইয়ের ছাপা অক্ষরগুলোর সংগে শিশুদের যখন যথেষ্ট পরিচয় ঘটে, তখন শিশুরা আর চীৎকার করে পড়তে চায় না। তখন যদিও সে নীরবে পড়ার চেষ্টা করে, তথাপি পূর্ব অভ্যাসের দরুণ তার ঠোঁট নড়তে থাকে সমানে।

নীরব পঠন অভ্যাসকে প্রথম থেকেই উৎসাহ দিতে হবে। উচ্চারণ শুদ্ধির জন্য অবশ্য সরব পঠনের যে প্রয়োজনীয়তা আছে, তা অস্বীকার করা যায় না। **নীরব পঠন মক্‌সো** করার **জন্য ফ্ল্যাস কার্ডের আমদানী করতে হবে।** ফ্ল্যাসকার্ড দিয়ে খেলা আর প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বেশ সুষ্ঠুভাবে নীরব পঠনের মহড়া চলতে পারে।

নীরব পঠনের কসরৎ ঃ

নীরব পঠনের অনুশীলন কাজ ও কথার উত্তর প্রত্যুত্তরের মাধ্যমে হতে পারে। মনে মনে কোন কার্ড থেকে কিছু পড়ে, প্রশ্নের উত্তরগুলো হয় কার্ডের নীচে কিংবা বোর্ডে লিখে দিতে হবে। ফ্ল্যাসকার্ডের নির্দেশ মতই সঠিকভাবে উত্তর দেওয়া বা কাজ করার উপরই নম্বর দেওয়া হবে। কাজেই বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে এই উত্তর প্রত্যুত্তর দেওয়ার খেলা বা প্রতিযোগিতা চলতে পারে। ধরা যাক, কার্ডে কাজ করার এই ধরণের নির্দেশ লেখা আছে ঃ—

১। টেবিলের কাছে যাও
২। ঘরের চারিদিকে লাফাও
৩। তোমার বইটা আমাকে দাও
৪। মাথার উপর হাত রাখো
৫। লাল রঙের কিছু দেখাও
৬। বই নিয়ে এখানে এসে পড়ো।

কার্ড থেকে মনে মনে নির্দেশগুলি পড়ে যে দল সঠিক ভাবে তা অনুসরণ করবে, তারাই অধিক সংখ্যক নম্বর পেয়ে জয় লাভ করবে।

ঐ ধরণের চিত্রানুসন্ধানের খেলা চলতে পারে। খেলার সরঞ্জাম হিসাবে প্রত্যেক ছেলেদের সামনে ছোট বাক্সে থাকবে—কার্ডের কাটা ছবি, বিচিত্র খেলনা, পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি। দলের নায়ক যখন যার কাছে ফ্ল্যাসকার্ডটি তুলে

ধরবে, সে তৎক্ষণাৎ সেই নির্দেশ পালন করবে। যেমন ধরা যাক হুকুম লেখা আছে। মনে মনে পড় ও সেই মত কাজ করো :—

(ক) নীল লাট্টুটা আনো

(খ) ড্রামটা এখানে নিয়ে এসো

(গ) ডল পুতুলটাকে পোষাক পরাও

(ঘ) পুতুলের পালঙ কৈ ?

কাজ ছাড়াও ঐ ধরণের মৌখিক প্রশ্নোত্তর হতে পারে। প্রশ্নগুলো অবশ্য হবে ছোট, সঠিক এবং স্পষ্ট করে লেখা। সকলকে কার্ডগুলো বিলি করা হবে। নেতা যার নাম ধরে ডাকবে, তাকেই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ের প্রশ্ন হলেই জিজ্ঞাসাবাদটি বেশ উপভোগ্য হবে। যেমন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশ্ন :—

১। রাতে কি তোমার ঘরের জান্‌লা খুলে রাখো ?

২। সকালে কি মুখ ধুয়েছ ?

৩। সকাল সকাল শোও তো ?

৪। সংগে রুমাল আছে কি ?

৫। খাওয়ার আগে হাত ধোও কি ?

আবার ব্যক্তিগত কুশল জিজ্ঞাসারও প্রশ্ন হতে পারে, যেমন :—

তোমার নাম কি ?

বয়স কত ?

কোথায় থাকো ?

তোমার কটি বোন ?

তোমার চুলের রং কিরূপ ?

বিদ্যালয় তোমার কেমন লাগে ?

বই পড়তে পার কি ?

কোন্ খেলা তোমার সবচেয়ে ভাল লাগে ?

তোমার বন্ধু কে ?

হাঁ-কি-না'র সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরের খেলাও হতে পারে। যেমন :—

প্রশ্ন	উত্তর
খরগোসের কি ডানা আছে ?……	না
গান গাইতে পারো কি ?………	হ্যাঁ
কুকুরে কি শিষ দিতে পারে ?…	না
জল কি শুকনো ?……………	না
বিড়াল কি মাছ ভালবাসে ?……	হ্যাঁ

গল্প থেকেও প্রশ্নোত্তরের খেলা হ'তে পারে। যেমন ধরা যাক ছেলেদের কংকাবতীর গল্প বলা হলো বা কার্ডে লেখা গল্পটি ছেলেদের মনে মনে পড়তে বলা হলো। পড়া শেষ হলে কার্ডগুলি সংগ্রহ করে, ছেলেদের হাতে প্রশ্নপত্রগুলো দেওয়া হলো। যেমন :—

কংকাবতী ঘর ছেড়ে চলে গেল কেন ?

কে তার আম খেয়ে নিয়েছিল ?

কংকাবতীর দাদা কি প্রতিজ্ঞা করেছিল ?

কংকাবতীর অভিমানের কারণ কি ? ইত্যাদি।

আবার অন্য ভাবেও এ খেলাটি করানো যায়। যেমন দু'প্রস্থ কার্ড থাকবে। একটিতে উত্তর, অন্যটিতে থাকবে প্রশ্ন।

ছেলেদের নেতা প্রশ্নপত্রটি ছেলেদের সামনে তুলে ধরবে, যার কাছে প্রশ্নোত্তরের কার্ডটি রয়েছে, সে উঠে জোরে জোরে তা পাঠ করবে। যেমন :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। তোমাদের বিদ্যালয়ের নাম কি?	আমাদের বিদ্যালয়ের নাম গান্ধী পাঠশালা
২। তোমাদের শ্রেণীতে ক'জন ছাত্র-ছাত্রী আছে?	৩০ জন ছাত্র এবং ১০ জন ছাত্রী আছে
৩। তোমাদের কে পড়ান?	যতীন বাবু

ইত্যাদি।

এ ছাড়া হারানো শব্দের অনুসন্ধান এবং শূন্য স্থান পূরণের মাধ্যমেও নীরব পঠনের মহড়া চলতে পারে। যেমন—কার্ডে অনেকগুলি বাক্য লিখিত থাকবে। তার কোন কোন স্থান শূন্য, কোথাও বা কয়েকটি শব্দ হারিয়ে গিয়েছে। ছেলেদের হাতে কার্ডগুলি দেওয়া মাত্রই তারা সেই লুপ্ত কথাগুলি খুঁজে বার করবে, কিংবা শূন্যস্থান পূরণে সচেষ্ট হবে। যেমন শূন্য স্থান পূরণের নমুনা :—

(ক) রাতে আমরা……।

(খ) সকালে আমরা…খাই। ইত্যাদি।

গল্পের ধাঁধা বা ছড়া থেকেও নীরব পঠন চলতে পারে। ধরা যাক সহজ গল্প বা ছড়া কার্ডে লেখা আছে। তার নীচে কতকগুলি প্রশ্ন আর তার উত্তরেরও নমুনা দেওয়া আছে। সেগুলি নীরবে পড়ে, ছেলেদের সঠিক উত্তর লিখতে বলা হবে।

কাহিনী ও প্রশ্ন একই কার্ডে থাকলে ভাল হয় ; তা না হলে গল্পটি পড়বার সময় দিতে হবে। নিম্নে গল্প ও প্রশ্নের নমুনা দেওয়া গেল :—

জেলের ছেলে পীতাম্বর। ঢেউ-এর নাগরদোলায় চেপে তার বাপ কোথায় চলে যেতো, কে জানে। সুমুদ্দুরেও তার ভয় ছিল না এতটুকু! বাড়ী ফিরে সে তার ছেলেকে কত নাবিকের গল্প বলতো। পীতাম্বর আনন্দিত হতো। সে নেচে গেয়ে বাপকেও খুসী করে তুলতো। চমৎকার! ছেলেকে বুকের মধ্যে টেনে নিতো পীতাম্বরের বাবা। খুশীতে পীতাম্বরের মন গলে যেতো।

প্রশ্নোত্তরের নীচে দাগ দাও :—

১। প্রশ্ন—পীতাম্বরের বাবা কি ছিল ?
উত্তর—নাবিক, সৈনিক, কৃষক, জেলে, ব্যবসায়ী।

২। তার বাবা দিনের বেলায় কোথায় যেতো ?
সহরে, পাড়াগাঁয়ে, সমুদ্রে, কারখানায়।

৩। তার বাবা বাড়ী ফিরে কাকে গল্প বলতো ?
যাত্রীদের, নাবিকদের, তার ছেলেকে।

৪। পীতাম্বর কি করে তার বাবাকে খুশী করতো ?
নেচে, খেলা করে, বই পড়ে, গান করে।

হেঁয়ালীর উত্তর প্রত্যুত্তরের মাধ্যমেও নীরব পাঠের মহড়া চলতে পারে। হেঁয়ালী বা ধাঁধার সমাধান করাই হবে খেলাটার মূল উদ্দেশ্য। একটি খামের মধ্যে তিনটি কি চারটি ছবি থাকবে ; যে কোন একটি ছবির বিষয় বস্তুকে অবলম্বন

করে রচিত হবে একটি হেঁয়ালী ধরণের ছড়া। কোন্ ছবিকে নিয়ে ছড়াটি রচিত হয়েছে, ছেলেরা তা খুঁজে বার করবে। হেঁয়ালীর সংখ্যা বাড়লে খেলাটা একটু কঠিন হয়ে পড়বে। যে দল যত বেশী হেঁয়ালীর জট ছাড়াতে পারবে, সে দলই অধিক সংখ্যক নম্বর পেয়ে জয় লাভ করবে। যেমন কোন একটি ছবিকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন হলো :—বস্তুর আকার কেমন ?

গোলাকার। আমি লাল গোলাকার উজ্জ্বল বর্ণ ;
দু'হাতে ছড়াই দিনে মুঠো মুঠো স্বর্ণ।
উদয় বিলয় মোর গগনের পারে ;
আমায় দেখেছ কভু, মনে কি পড়ে ?

অথবা। রোজ দিন রাত্তির আমায় দেখতে পাবে,
রাস্তার কোণে দাঁড়িয়ে আছি চুপ্‌চাপ্‌ একভাবে।
আমার মুখ খুব প্রশস্ত—
ঐ মুখ দিয়ে চিঠি পত্তর সমস্ত
পেলেই এক্কেবারে গিলে খাই ;
আমি কি ঠিক করে বল দেখি ভাই ?

এখন ঠিক উত্তরগুলির নীচে দাগ দাও :—

সূর্য, পাখী, ঠেলা গাড়ী, ডাকবাক্স। [নমুনা]

এ ছাড়া কাজ ও খেলা একসঙ্গে চলতে পারে এমন খেলারও ব্যবস্থা করা যেতে পারে। পঠন এবং হাতের কাজের কার্ড-এ কাজের নির্দেশ লেখা থাকবে। কার্ডটি পড়া শেষ

হলে, ছেলেরা তা উল্টে রাখবে। তারপর কার্ডের নির্দেশ মত একজন চিৎকার করে পড়বে ঃ—

আমার দুটি লম্বা কান আছে,
আমার লেজও আছে,
মাঠের মধ্যে গর্তে থাকি,
ঘাসের দেশে লাফিয়ে বেড়াই,
আমি কে ?
আমাকে আঁকো দেখি ?

এই নির্দেশ মত ছেলেরা প্রথমে উত্তর লিখবে। তারপর রং তুলে নিয়ে ছবি আঁকবে, যার ছবি ও উত্তর উক্ত বিবরণের সংগে মিলে যাবে, সেই বেশী নম্বর পাবে। এই ভাবে পড়া ও কাজ চলবে একই সংগে।

সরব পঠনের মহড়া ঃ

এবার মৌখিক পঠনের বিষয় আলোচনা করা যাক। তার আগেই মনে রাখতে হবে যে, ছেলেদের লিখন পঠন যতদূর সম্ভব খেলার ছলে কাজের মাধ্যমে হলেই ভাল হয়। মৌখিক পঠনের মহড়ার জন্যও নানা ধরণের খেলার আমদানী করা যেতে পারে। ধরা যাক কোন একটি গল্পাংশ ছেলেদের সরবে পড়তে হবে। গল্পটি উচ্চস্বরে পড়ার আগে ছেলেরা মনে মনে সেটা একবার পড়ে নেবে কোন কঠিন শব্দ বা উচ্চারণের কথা জিজ্ঞাসা করলেই, শিক্ষক মহাশয় তা বলে দেবেন। এক্ষেত্রে সব সময় মনে রাখতে হবে যে, পঠনের সময় ছেলেদের মধ্যে

যাতে interest and continuity of thought বজায় থাকে, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে। প্রয়োজন হলে special drill for difficult word অর্থাৎ কঠিন শব্দ উচ্চারণের জন্য বিশেষ অনুশীলনের ব্যবস্থা করতে হবে। এই প্রসংগে মনে রাখতে হবে যে, ভাল পঠনের জন্য বিশেষ করে প্রয়োজন হবে clear, direct pleasing and well-modulated voice. অনুশীলনের দ্বারা কণ্ঠস্বরের কোন পরিবর্তন করানো সম্ভব নয়, তবে অন্যান্য গুণাবলী পরিমার্জিত ও সংশোধিত করা যেতে পারে। মৌখিক পঠনের সময় এই কথাটি মনে রাখতে হবে যে, গঠনমূলক সমালোচনা ও সহানুভূতির দ্বারা শিশুদের আত্মবিশ্বাস এবং উৎসাহকে উদ্দীপ্ত করতে পারলে, অতি সহজেই গঠন প্রগতি আসবে।

সহজ নাটক সরব বা নীরব পঠনের পক্ষে ফলপ্রসূ। নাটকের পরিকল্পনা ও সংলাপ ছেলেদের দ্বারাই বিরচিত হলে, তা অভিনয়ে কিংবা সরব বা নীরব পঠনে কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু নাটকের ভাষা যদি কঠিন, পরিকল্পনাটি যদি জটিল হয়, তা হলে অর্থ বুঝতে না পারার দরুণ নাটকটি পড়া বা অভিনয় করা ছেলেদের কাছে কঠিন হতে পারে। কারণ Expression is very largely the result of comprehension. কাজেই উপলব্ধি যেখানে স্পষ্ট, অর্থ সেখানে পরিষ্কার, প্রকাশের ভাষাও সেখানে সহজ, সরল।

এবার সরব ও নীরব পঠনের সুবিধা অসুবিধার কথা

আলোচনা করা যাক। সরব পঠনটা ছোটদের পক্ষে স্বাভাবিক এবং বাঞ্ছনীয় হলেও এতে সময় ও শক্তির অযথা নষ্ট হয়। সরব পঠন অতি মাত্রায় শ্রম সাপেক্ষ। কাজেই এতে শিশুদের অতি-পরিশ্রমজনিত ক্ষতি হতে পারে। মুখস্থ করা বা আবৃত্তি অভিনয়ের জন্য সরব পঠন অপরিহার্য। অপরপক্ষে নীরব পঠন শুধু শক্তি, সময় এবং প্রচেষ্টার অপব্যয় নিবারণ করে তা নয়, শিশুদের মনোসংযোগ, একাগ্রতা এবং তন্ময়তাকে বাড়িয়ে তোলে। ফলে অভিন্ন মনোযোগ নিয়ে, গভীর আগ্রহে অন্তর দিয়ে বিষয়বস্তু অনুধাবন করে অনেকক্ষণ ধরে পড়লেও শিশুদের তেমন অবসাদ আসে না। উচ্চ-শিক্ষার্থীর পক্ষে নীরব পঠন অপরিহার্য। কারণ নিত্য আট-দশ ঘণ্টা চেঁচিয়ে পড়া physically অসম্ভব। কাজেই এ ক্ষেত্রে নীরব পঠনই শ্রেয় এবং বিষয়বস্তু অনুধাবনের পক্ষে ঢের বেশী কার্যকরী।

ছোটদের পঠন শিক্ষার জন্য পঠন সরঞ্জামের একান্ত প্রয়োজন। প্রস্তুতি ভিন্ন পাঠদান করা সম্ভব নয়—বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে। এই সরঞ্জাম লেখাপড়ার বহির্ভাগের দিক। বর্তমান শিশু শিক্ষা ব্যবস্থার উপকরণকে অবহেলা করা হয়নি। আমরা জানি যে, পঠন-প্রগতি অনেকখানি নির্ভর করে eye habitsএর উপর। যাতে এই দৃষ্টি পরিচালনা নির্ভুল ও সঠিকভাবে হয়, সেজন্য প্রয়োজন hygienic reading materials। মনস্তত্ত্ব সে প্রস্তুতির বিধান দিয়েছে। বলেছে—ছোটদের জন্য লিখিত বইয়ের হরফ হবে : গোটা গোটা, স্পষ্ট ও বড়। লেখাগুলো টানাটানা একই লাইনে

হলে ভাল হয়। বইয়ের ছবিগুলো যেন বাক্যের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে বাক্যের সংযোগ ছিন্ন না করে। যত দূর সম্ভব ছবিগুলো উপরে থাকলেই ভাল হয়। ছবিগুলো অবশ্যই রঙ্‌চঙে সুন্দর হবে। প্রত্যেকটি ছবির সংগে থাকবে কথার সংগতি। বইটি এমনভাবে বাঁধান হবে যে, ছেলেরা যেন সহজেই সোজাভাবে তা খুলতে পারে may open flat।

ছোট ছোট হরফে লেখা লাইনগুলি অনুধাবন করা ছেলেদের পক্ষে বেশ অসুবিধাজনক। সে বই যদি ছেলেদের পড়তেই দিতে হয়, তবে তারা যখন সেই বইয়ের কোন নির্দিষ্ট লাইন পড়বে, তখন তার নীচেটা এক টুকরা কাগজ দিয়ে ঢেকে পড়বে।

তাছাড়া প্রথম পড়ার বই হবে সংক্ষিপ্ত। কথা ও বাক্যগুলি হবে সহজ এবং পরিচিত। বেশ খানিকটা পড়ার অভ্যাস হয়ে গেলে, বিচিত্র ধরণের অনেক বই পড়তে দেওয়াই ভাল। কোন একটা বইয়ে অধিকক্ষণ আটকে রাখা ঠিক নয়, ওতে শিশুদের মনে বিরক্তিকর একঘেয়েমি আসতে পারে। ছেলেরা যখন উৎসাহে উন্মুখ,—যখন তারা বুঝতে পারছে যে, তাদের উন্নতি হচ্ছে—তখন তাদের নূতন নূতন বই সরবরাহ করতে হবে। কারণ a new book is a great incentive to further effort. এ ছাড়া শিশুর প্রথম বই হবে, তাদের কৌতূহলের সংগে সংযুক্ত। প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত পরিচিত কাহিনী, ছড়া এবং কবিতা থাকবে শিশু-পাঠ্য পুস্তকে। তবে বয়ঃবৃদ্ধির সংগে ছেলেদের পঠন ক্ষমতা বৃদ্ধি হলে এমন

বই তাদের দিতে হবে, যা তাদের আগ্রহকে উত্তরোত্তর বাড়িয়ে তুলবে, তার ধারণাকে প্রসারিত করে দেবে।

শ্রেণী পাঠাগার পরিচালনার মধ্য দিয়ে ছোটদের লিখন পঠনের কাজ বেশ ভালভাবে চলতে পারে; অবশ্য এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্বই কিছুটা বেশী। কারণ তাকে এক সংগে অনেক কাজ করতে হয়। ভাল করে পড়তে পারা, সময় মত নোটিশ লেখা, যে যা বই চায়, তা দেওয়ার ব্যবস্থা করা এবং ঠিক জায়গায় ঠিক বইটি গুছিয়ে রাখা প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলোই করতে হয় পাঠাগার পরিচালককে।

শেষ কথা, পঠন-প্রগতির জন্য প্রগতি-পত্র রাখতে হবে। তা না হলে শিশুরা কে কোন পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে, কে কতখানি পিছিয়ে আছে, কার ব্যক্তিগত সাহায্যের প্রয়োজন, তা জানা সম্ভব হবে না। উন্নতির পরিমাপটি চোখের সামনে থাকলে, সাহায্য করার দিক থেকে বিশেষ সুবিধা হবে। প্রতি সপ্তাহের শেষে পঠন পরীক্ষা নিতে হবে এবং তার ফলাফল প্রত্যেকের কার্ডে লিখে দিতে হবে।

পঠন-শিক্ষা-প্রণালী ঃ

পঠন-শিক্ষার একাধিক প্রণালী আছে। শিক্ষা-দানের পক্ষে কোন্‌টি প্রকৃষ্ট, সে সম্বন্ধে মতভেদের অন্ত নেই। নীচে পঠন-শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা গেল ঃ—

১। বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ প্রণালী (Analytic Method) ঃ—বর্ণ বা অক্ষর কতকগুলি সরল ও বক্ররেখার সমষ্টি। কেমন করে সেই বর্ণ বা অক্ষর গঠিত হয়েছে, প্রথমে তা বিশ্লেষণ করে ছেলেদের দেখিয়ে দিতে হবে। ছেলেরা সেগুলি দেখে শ্লেটে রেখাগুলি আঁকবে। পরে দেখিয়ে দিতে হবে, কেমন করে রেখাগুলির সংশ্লেষণে বর্ণটি তৈরী হয়েছে। এইভাবে বর্ণ-পরিচিতি হ'লে, ছেলেরা সহজেই পড়তে শিখবে। এই প্রণালীটি বিজ্ঞান সম্মত নয়। এই প্রণালীর দোষ এই যে, রেখা-অঙ্কন থেকে বর্ণ-লেখা ও পড়ার কাজ চলে যান্ত্রিক ভাবে। কেননা, শিশুর নিকট রেখা বা বর্ণের কোন অর্থ নেই।

২। বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতি (Alphabetic Method) ঃ— এই পদ্ধতি অনুসারে বর্ণ-পরিচিতি ঘটে প্রথমে। ছেলেরা একটি একটি করে যখন সমস্ত বর্ণগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়, তখনই তাকে পড়তে দেওয়া হয়। বিভিন্ন বর্ণের সাহায্যে গঠিত শব্দগুলি ছেলেরা পড়তে শেখে। পূর্বে এই পদ্ধতির বহুল প্রচলন ছিল। আমাদের দেশে এখনও এই পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এ পদ্ধতিও শিশু-মনোবিজ্ঞান সম্মত নয়। কারণ শিশুরা এক একটা বর্ণ উচ্চারণ করতে শেখে না; তারা এক একটা বাক্য বা বাক্যাংশ বলতে শেখে। কাজেই আলাদা আলাদা ভাবে বর্ণগুলির কোন মূল্য বা অর্থ নেই শিশুদের কাছে। ফলে এ শিক্ষায় শিশুরা কোন আনন্দ পায় না। কাজেই এ-পদ্ধতি শিশুদের কাছে তেমন আকর্ষণীয় নয়।

উপরের অঙ্কে ছেলেরা পোক্ত হলে, পরের পর্যায়ে ছোট ছোট হাতে রাখা বা ধার করা বিয়োগ করাতে হবে। নীচে তার নমুনা দেওয়া গেল :—

১২—৬=৬
১৭—৯=৮

```
 ১২
—৮
———
  ৪
```

১৩—৬=৭
১৪—৬=৮

```
 ১৪
—৭
———
  ৭
```

উপরে অঙ্ক থেকে ধার করা রীতিটি ভালো ভাবে বুঝা যাবে। উপরের 'এককে'র ঘরে ২ আছে, কাজেই ২ থেকে ৬ বাদ দেওয়া যায় না ; কাজেই দশককের ঘর থেকে ১ ধার করতে হবে, তা হলে সংখ্যাটি দাঁড়াবে ১২ ; এখন ১২ থেকে ৬ বিয়োগ করলে বাকী থাকবে ৬।

ক্রমশঃ কঠিন থেকে অপেক্ষাকৃত কঠিন অঙ্ক দিতে হবে, যেমন—

```
  ২৪          ২২
—১৬        —১৮
———        ———
   ৮           ৪ ইত্যাদি।
```

এর পর আসে 'শতক'কের ঘরের বিয়োগের কথা। এই ধাপে আসার আগে ১০ দশে যে ১০০ হয়, সেটা একটু ঝালিয়ে নিতে হবে। এই সময় শূন্য '০' সংখ্যাটির ব্যবহারও শিশুদের ভালো করে শেখাতে হবে। সংখ্যার ডান দিকে '০' শূন্যের মূল্য আছে ; কিন্তু বাঁ দিকে '০' বসলে শূন্যের কোনই মূল্য থাকে না, যেমন—১০ দশ, ০১ এক।

গুণ

গুণ জিনিষটা প্রকারান্তরে যোগেরই রূপান্তর মাত্র। একই সংখ্যা বার বার লিখে যোগ করতে অনেক জায়গা লাগে, তাই একই সংখ্যা একাধিকবার যোগ করার পরিবর্তে গুণের প্রবর্তন করা হয়েছে। শিশুদের উদাহরণ দিয়ে এই কথাটা বুঝিয়ে দিতে হবে।

যেমন :— (ক)

```
  ৪
  ৪
  ৪
  ৪
 ───
 ১৬
```

(খ)

```
   ৪
  ×৪
 ────
  ১৬
```

চারটি '৪'কে পাশাপাশি বা নীচে নীচে রেখে যোগ করলে, তার যোগফল দাঁড়ায় ১৬ ; এই ১৬-র মধ্যে চারটি ৪ আছে। কাজেই চার ৪ বার যোগ না করে ৪ × ৪ গুণ করলে একই ফল পাওয়া যাবে। একই সংখ্যার 'যোগ'কে সোজা ভাবে বা তাড়াতাড়ি করার প্রণালীকে আমরা গুণ বলি।

৪ + ৪ + ৪ ; ২ + ২ + ২ + ২ ইত্যাদি এই ধরণের যোগগুলি শিশুরা যখন ভালোভাবে করতে পারবে, তখনই গুণের ধারণা দিতে হবে।

এখন দেখা যাক, কি ভাবে শিশুদের প্রথম গুণের ধারণা দেওয়া সম্ভব। প্রথম দিকে গুণ না পারলে ২ + ২ + ২ + ২ = ৮, ৩ + ৩ + ৩ = ৯ ইত্যাদি ধরণের একই সংখ্যার যোগ করাতে

অক্ষরগুলি স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারণ করান। আমের ছবি দেখিয়ে শিক্ষক বলান আ-ম। তাঁর অনুকরণে শিশুরাও আ-ম বলতে শেখে। এইভাবে শিশুরা কতকগুলি নাম বাচক শব্দ শিক্ষা করলে, শিক্ষক সেই শব্দগুলি বোর্ডে লিখে দেন। অথবা বড় বড় অক্ষরে লেখা—সেই শব্দগুলি শিশুদের দেওয়া হয়। তখন সেই শব্দের উপর অঙ্গুলী সঞ্চালনের দ্বারা শিক্ষককের অনুকরণে শিশুরা বার বার উচ্চারণ করে শব্দগুলি শিক্ষা করে। এই পদ্ধতিতে শিশুর দর্শনেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয়, বাগিন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের যুগপৎ ব্যবহার হয়। এইভাবে শিশুদের পঠন-শিক্ষা চলে। এর জন্য বহু উপকরণের প্রয়োজন হয়।

৭। বাক্যক্রমিক প্রণালী (Sentence Method) :—
এই প্রণালীতে শিশুরা বাক্যের সাহায্যে পড়তে ও লিখতে শেখে। শিশুরা যখন অর্থবোধক বাক্য ব্যবহার করতে শেখে, তখন সহজেই এই প্রণালীতে শিশুদের পড়তে শেখানো যায়। একে মনোবিজ্ঞান সম্মত শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি বলে শিক্ষাবিদরা অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, শিশুরা যে মুহূর্তে কথা বলতে আরম্ভ করে, সেই সময়ে সে বাক্যের অর্থ প্রকাশক শব্দ বা বাক্যাংশ ব্যবহার করে। অতএব শিশুর কাছে পূর্ণ বাক্য অর্থবোধক ও অর্থ-প্রকাশক। সেইজন্য পঠন শিক্ষার পক্ষে পূর্ণবাক্য থেকে পড়া ও লেখা শিক্ষা করা সহজ সাধ্য। এই শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য দুটি জিনিষের প্রয়োজন হয়। প্রথম হচ্ছে কর্ম, দ্বিতীয় হচ্ছে আবেষ্টনী। কাজ ও পরিবেশ থেকে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে সমস্ত কথা

শিশুরা জানে ও শেখে, সেই কথা সম্বলিত বাক্যগুলি বার বার আবৃত্তি করে, তার অন্তর্গত অক্ষরগুলি বিশ্লেষণ করে শিশুরা অতি সহজেই পড়তে বা লিখতে শেখে। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক, ছবি আঁকার পর, শিশুরা এই বাক্যগুলি উচ্চারণ করলো, 'আমরা ছবি এঁকেছি। তারা হয়তো বাঘ, ঘোড়া, ঘর প্রভৃতি আরও অনেক ছবি এঁকেছে। তাই যখন তাদের জিজ্ঞাসা করা গেল, আর কি এঁকেছ? তখন তারা বলবে যে, 'আমরা বাঘ এঁকেছি', আমরা ঘোড়া এঁকেছি, আমরা বাড়ী এঁকেছি। এখন দেখা যাচ্ছে যে, প্রত্যেকটি বাক্যের মধ্যে 'আমরা' ও 'এঁকেছি' শব্দগুলির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এইজন্য বাক্যক্রমিক প্রণালীতে পাঠ রচনা করতে হ'লে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে :—

১। বাক্যগুলি সহজ সরল ও শিশুর পরিচিত হওয়া উচিত।

২। একাধিক শব্দের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার থাকবে।

৩। বাক্যগুলির মধ্যে অর্থের ধারাবাহিকতা থাকবে। কাহিনীর অংশ থাকলে ভালো হয়।

বাক্যক্রমিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করলে শিশুরা একটি সমগ্র জিনিষ আয়ত্ত করতে পারে, সেজন্য তারা আনন্দ পায়। সেই সঙ্গে শিশুদের পড়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, তারা সাবলীল ভংগীতে পড়তে শেখে। পড়ায় শিশুদের দৃষ্টি ও বাচনের প্রসার ঘটে। আরম্ভের সময় পড়ার প্রগতি অপেক্ষাকৃত ধীর মন্থর হলেও শেষ পর্যন্ত এই পদ্ধতিতে শিশুরা অল্প সময়ে বেশী উপকৃত হয়। এইজন্য শিক্ষাবিদরা এই প্রণালীকে মনোবিজ্ঞান সম্মত এবং শ্রেষ্ঠ-পঠন-পন্থা বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

পঠন-প্রগতি পত্র

(মাসিক)

সাপ্তাহিক প্রগতি	কতগুলি শব্দ শিখেছে	পড়ার গতি কেমন	অর্থগত সামগ্রিক-রূপে পড়তে পারে কিনা	দ্রুত ও নির্ভুল শব্দ পরিচিতি হয়েছে কিনা	দৃষ্টি পরিচালনা সঠিক হয়েছে কিনা	শব্দ পরিচিতির ব্যাপকতা কত	মন্তব্য
প্রথম সপ্তাহে	১০	ধীর	না	হয় নি	হয় নি	৫টি শব্দ	উচ্চারণ দোষ আছে
দ্বিতীয় সপ্তাহে	২০	মন্থর	কিছুটা পারে	নূতন শব্দ চিনিতে পারে না	অনেকটা হয়েছে	৮টি "	অনুশীলনের দরকার
তৃতীয় সপ্তাহে	১১	অপেক্ষাকৃত দ্রুত	অনেকটা পারে	পুরানো শব্দ চিনিতে পারে	অনুশীলনের দরকার	১০টি "	ঐ
চতুর্থ সপ্তাহে	১২	সাবলীল	আরও অনুশীলন দরকার	আরও তালিমের দরকার	ঐ	১১টি "	ঐ

বিশেষ অনুশীলনের জন্য দরকার

বানান করে পড়ে কিনা	যুক্তাক্ষর পড়তে অসুবিধা হয় কিনা	কি কি উচ্চারণের দোষ আছে	পড়ার সময় কোন শব্দ বাদ পড়ে কিনা	বাক্যের যতি মেনে পড়ে কিনা	স্বরের সঠিক উঠা-নামা হয় কি	মন্তব্য
না	কিছুটা হয়	শ, স, ড় এবং র পার্থক্য ঠিক করতে পারে কিনা	হ্যাঁ	না	না	আদর্শ পাঠ দান ও পঠন অনুশীলনের দরকার

॥ লিখন-শিক্ষা ॥

"Writing makes a man perfect."

লেখার মধ্যে থাকে সমগ্র মানুষের ব্যক্তিমনের ছাপ।

"Writing is a difficult subject to teach."

চোখের দেখা, কানের শোনা, মনের ভাবনা—লেখার মধ্যে জ্বল জ্বল করে।

লেখাটা মনের আয়না, হৃদয়ের ছবি।

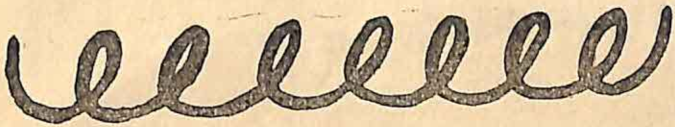
লেখার ব্যাপারটা শিশুদের কাছে বেশ একটু মুস্কিলের। ছেলেরা ঠিকমত লিখতে শেখে, পড়তে শেখার অনেক পরে। লেখাটা বেশ একটু কঠিন। কারণ লেখার জন্য যে পৈশিক ও স্নায়বিক নিপুণতার প্রয়োজন, যা শিশুদের আয়ত্ত হ'তে সময় লাগে। কাজেই পড়তে আরম্ভ করার সংগে সংগে চট্ করে শিশুরা লিখতে পারে না। এর জন্য রীতিমত প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। পরিবেশের প্রভাব থেকেই অবশ্য লেখার প্রেরণা আসে। শিশুরা দেখে তার বাবা টেবিলে বসে খাতা ভরে কি লিখছে, অপেক্ষাকৃত বড় ভাইবোনেরা শ্লেট পেন্সিল নিয়ে দেগে দেগে রোজ কি যেন লেখে—এটা ছোটদের কাছে বেশ মজার ব্যাপার বলে মনে হয়। আর পাঁচ জনের দেখা দেখি তারও ইচ্ছে হয় লিখতে, কিন্তু অপটু হাতে সে বৃথাই বড়দের অনুকরণ করে ; কিন্তু কিছুই লিখতে পারে না। আঁকা বাঁকা হিজিবিজি আঁচড়ে ভাইবোনের খাতা পত্তর শ্লেট ভরিয়ে তোলে। সে জন্যে বকুনিও কম খেতে হয় না তাকে। তবু তার উৎসাহ কিছুতেই কমতে চায় না, আড়ালে আবডালে তার হিজিবিজি কাটার মক্‌সো চলে। ওটা যে শিশুদের কুণ্ডয়ন প্রবৃত্তির স্বধর্ম। আঁচড় কাটাটা আমাদের কাছে অর্থহীন হ'লেও, শিশুদের কাছে ওর যথেষ্ট মূল্য আছে ; কারণ হিজিবিজিটাই যে শিশুর প্রথম ভাষা। কাজেই লিখন শিক্ষার অনুশীলন পর্বে ওর অবদান যথেষ্ট।

লেখার জন্য সময় এবং প্রস্তুতি দু'টোরই একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু অনেকেই এ কথাটা ভেবে দেখেন না। তাঁরা মনে করেন যে, কোন রকমে হাতে খড়ি দিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ছেলেদের লিখতে পড়তে শেখাতে পারলেই হ'লো, অত হাঙ্গামা করে লাভ কি? পাঁচ বছরের মধ্যেই শিশু দিগ্‌গজ হ'য়ে উঠুক, এটাই অভিভাবকেরা মনে মনে কামনা করেন; কিন্তু তারা ভুলে যান যে, শিশুদেরও ইচ্ছা অনিচ্ছা, শারীরিক সামর্থ্য বলে একটা জিনিষ আছে। যা'র বিরুদ্ধে জোর করে কিছু করা ঠিক নয়। এই কারণে লিখন প্রস্তুতির জন্য বিশেষ অনুশীলনের প্রয়োজন। শিশুরা যত দিন না সে ক্ষমতা অর্জন করতে পারে, ততদিন পর্যন্ত অভিভাবকদের একটু ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। সে সময়টা অবশ্য চলবে পুরা দমে প্রস্তুতির মহড়া।

আঁচড় কাটাটাই লিখন প্রস্তুতির প্রথম স্তর। তিন বছর বয়স থেকেই হিজিবিজি কাটার পাগলামি শিশুদের পেয়ে বসে। তখন আঁকা বাঁকা অপটু আখরে তারা কত কথাই না প্রকাশ করতে চায়, তা কে জানে। শিক্ষাবিদরা শিশুদের এই পর্যায়কে হিজিবিজির বয়স বলে অভিহিত করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, শিশুরা ইচ্ছামত যতই হিজিবিজি কাটবে, ততই সহজে তাদের পৈশিক ও স্নায়বিক দক্ষতা বাড়বে; এবং এই স্বৈচ্ছিক ও স্বাধীন অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে শিশুরা লিখতে শেখার ক্ষমতা অর্জন করবে। কাজেই এক্ষেত্রে শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য হবে তাদের সেই অর্থহীন হিজিবিজি গুলোকে অক্ষরে রূপান্তরিত

করার কাজে সাহায্য করা। যেমন ধরা যাক, খেয়াল খুশী মত শিশুরা নিম্নলিখিত হিজিবিজি রেখা আঁকলো।

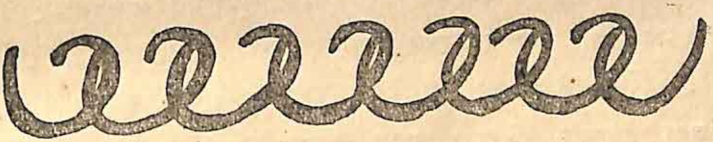
১নং চিত্র



হিজিবিজি

এখন একটু বুদ্ধি খাটিয়ে সামান্য একটু রদবদল করে ঐ হিজিবিজিকে 'ত' কিংবা 'অ' অক্ষরে সহজেই পরিবর্তিত করা যায়, যেমন :—

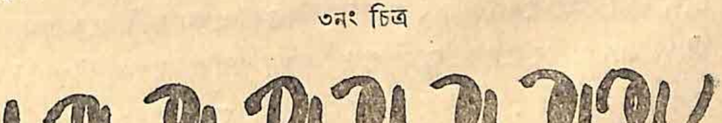
২নং চিত্র



এখানে 'ত' অক্ষরে রূপান্তরিত করা হয়েছে

আবার 'ত' থেকে 'অ' অথবা 'এ' ও হতে পারে। যেমন—'অ'

৩নং চিত্র



'অ'-এ পরিবর্তিত করার চেষ্টা করা হয়েছে

আবার 'এ'-ও হতে পারে। যেমন :—

৪নং চিত্র

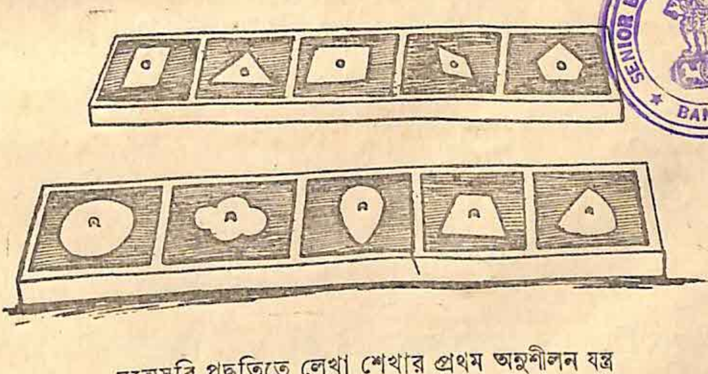


ছড়ি

এই ধরণের বিচিত্র হিজিবিজির নমুনা সংগ্রহ করে অল্প আয়াসেই ছেলেদের অক্ষর এবং বিভিন্ন সংখ্যা লেখার ধারণা দেওয়া যায়। তবে কোন্ ধরণের হিজিবিজি থেকে সত্যিকার কি অক্ষর আসতে পারে, কোন্ চিহ্নটা শিশুদের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক হবে, সে বিষয়ে এখনও যথেষ্ট গবেষণা করবার অবকাশ আছে। কাজেই অনেকটা আনুমানিক ধারণা নিয়েই এ কাজ শুরু করতে হবে। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে ঠিক যে, হিজিবিজিটাই শিশুর অপরিণত বয়সের প্রথম ভাষা। এর মধ্য দিয়েই শিশুরা তার মনের ভাব প্রকাশ করে; এক একটা চিহ্নের এক একটা নাম দিয়ে সে কত কথাই না বলতে চায়। কাজেই আঁচড় কাটাকে নেহাৎ পণ্ডশ্রম বলে, শিশুর লেখা শেখার পর্যায় থেকে তাকে কোনক্রমে বাদ দেওয়া চলে না। অনেকে হিজিবিজিটাকে শিশুর প্রথম ছবি বলেছেন। তাঁরা আরো বলেছেন যে, শিশুর প্রথম ভাষা যখন চিত্রধর্মী, তখন হিজিবিজি থেকেই তার প্রথম পাঠ শুরু হওয়া উচিত। কারণ, এক অর্থে শিশুদের প্রাথমিক চিত্রগুলিই—তাদের ছবি, ভাষা—সব কিছুই।

মন্তেসরি কিন্তু লেখা শেখার অনুশীলনের উপর-ই জোর দিয়েছেন। শিশুরা যাতে অনুশীলনের নানা পর্যায় অতিক্রম করে অতি সহজেই লিখতে পারে, তার জন্য তিনি নানা ধরণের অনুশীলন-যন্ত্র অবিষ্কার করেছেন। এগুলোকে তিনি 'ইনসেট' (অর্থাৎ কাঠের ফ্রেমের গর্তে লাগানো ও খোলার খেলা) নামে অভিহিত করেছেন। যন্ত্রটি আর কিছুই নয়, একটা লম্বা ফ্রেমের বাক্সের উপরকার ঢাকনার উপর বিভিন্ন ধরণের যে সারি সারি গর্ত আছে, সেই গর্তের আকারের কাঠের ছোট ছোট টুকরোগুলো ঠিক জায়গায় ছেলেদের লাগাতে দেওয়া হয়। যেমন ধরা যাক গোল ফুটোতে, সেই আকারের গোল কাঠের পাতলা টুকরো ঠিক করে লাগানো ও খোলা। নীচে অনুশীলন যন্ত্রের চিত্র দেওয়া গেল।

৫নং চিত্র (ক) ও (খ)

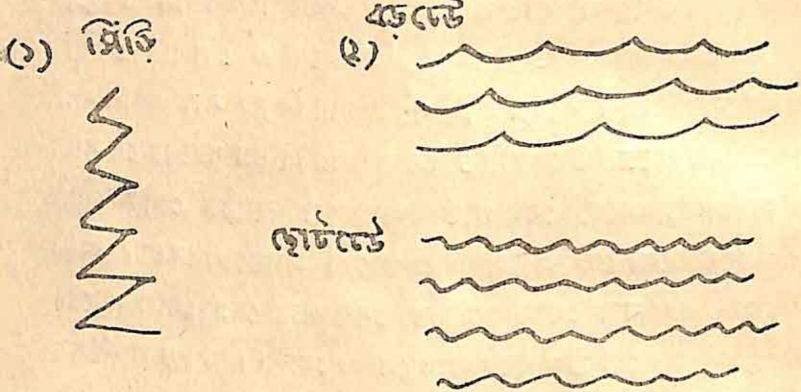


মন্তেসরি পদ্ধতিতে লেখা শেখার প্রথম অনুশীলন যন্ত্র

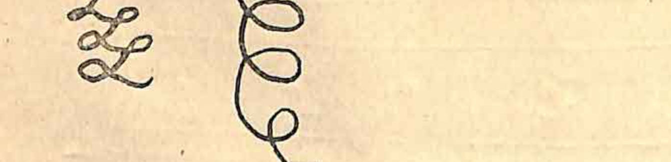
এই অর্থহীন ছবি আঁকার পরের অবস্থাকে শিক্ষাবিদরা অভিজ্ঞান বা প্রতিরূপক (symbolic stage) অবস্থা বলে

অভিহিত করেছেন। চার বছরের মধ্যেই এ অবস্থা পার হয়ে যায়। কিছুদিন হিজিবিজি কাটতে কাটতে তারা একটা একটা

৬নং চিত্র



৭নং চিত্র



বিশেষ চিহ্নের নামকরণ করতে শেখে। তখন হিজিবিজি গুলো শিশুদের কাছে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠে। যেমন এই ধরণের হিজিবিজি গুলোকে শিশুরা 'সিঁড়ি', 'দোলনা' 'ঢেউ' ধোঁয়া—

কত কি নামে অভিহিত করে। আগের পৃষ্ঠায় শিশুদের দেওয়া হিজিবিজির নামকরণের নমুনা দেওয়া হয়েছে।

এর পরের অবস্থাকে প্রতিনিধিরূপী (representative stage) প্রতিফলন পর্যায় বলা চলে। চার থেকে দশ বছর পর্যন্ত শিশুরা নানা রেখার মধ্যে নিজ মনের চিন্তা-বস্তু ও চিত্রের প্রতিফলনকে রূপ দিতে সচেষ্ট হয়। অর্থাৎ প্রতিফলনের উপযোগী চিত্রই তারা আঁকে। সাধারণতঃ তাদের আঁকা বাঁকা অপটু আখরে ধরা পড়ে তাদের চিন্তা, বস্তুর বহিরেখা, এবং কর্মময় জিনিসের ছবি। এই ধরণের স্বেচ্ছিক ছবি আঁকার শিক্ষণীয় মূল্য আছে যথেষ্ট। এগুলির অধিকাংশই তার অভিজ্ঞতা সঞ্জাত। অভিজ্ঞতার বাইরের কোন কিছু সে আঁকতে পারে না। কাজেই জোর করে তার অভিজ্ঞতার বাইরের কিছু আঁকতে দিলে, তা'র আত্ম-প্রকাশের ক্ষমতা ব্যাহত হতে পারে।

এইজন্য অনেকে বলেছেন যে, শিশুর লিখন-শিক্ষা হবে তার পর্যবেক্ষণ ও অংকন ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। কাজেই পর্যবেক্ষণ ও অংকন ক্ষমতাকে কেন্দ্র করেই ছেলেদের লেখা শেখাতে হবে।

কখন লেখা শেখাতে হবে ?

ঠিক কখন লেখা শেখাতে হবে, এ নিয়ে মত বিরোধ আছে। অনেকে পাঁচ ছ' বছরের মধ্যেই লেখা শেখানোর

কথা বলেছেন। শিক্ষাবিদরা কিন্তু ও বয়সটাকে প্রস্তুতির পর্যায়ে ফেলেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, শিশুরা যখন স্বয়ং সক্রিয় হয়ে উঠে, সেই বয়সে অর্থাৎ সাত বছর বয়স থেকেই রীতিমত ভাবে শিশুদের লেখা শেখার কাজ শুরু করা যেতে পারে। তার আগে কিন্তু তার প্রস্তুতির কাজ চলবে। কারণ অপটুতা বা অক্ষমতা সত্ত্বেও হিজিবিজি কাটতে কাটতেই সক্ষম শিশু লেখার ইচ্ছা প্রকাশ করে ; বড়দের লিখতে দেখে, নানা কাগজের আঁটা লেবেলগুলো পড়তে পড়তে, বইয়ের লেখা ইত্যাদি দেখে শিশুদের লেখার আগ্রহ জন্মায় ; এবং তখন থেকে তারা লিখতে সচেষ্ট হ'য়ে উঠে। কিন্তু যতদিন না তারা পৈশিক দক্ষতা অর্জন করে, ততদিন তাদের কিন্তু লিখতে দেওয়া উচিত নয়। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের দেখতে হবে যে, পূর্ব অনুশীলনের মধ্যে তার কতখানি মানসিক বিকাশ সাধিত হয়েছে, তার কতটুকু পৈশিক দক্ষতা এসেছে, তা না হ'লে শিশুদের উপর অবিচারই করা হবে। লেখা শেখানোর সময় মনে রাখতে হবে যে Over strain must be avoided.

এই জন্যে অনেক শিক্ষাবিদ শিশুদের ভবিষ্যৎ ও শারীরিক স্বাস্থ্য-এর দিকে দৃষ্টি দিয়ে, শিশুদের লেখা শেখার ব্যাপারটাকে অন্ততঃ পক্ষে ছ' বছর পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ তাঁরা বলেছেন যে, ঐ বয়সে শিশুরা সাধারণতঃ 'মটর এবিলিটি' অর্জন করতে পারে না। সাত থেকে দশ বছরের মধ্যে শিশুরা ঐ ক্ষমতা অর্জন করে, তাদের অংগ প্রত্যংগ

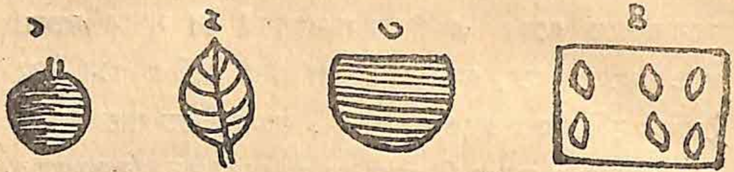
সজাগ ও সক্রিয় হয়ে উঠে। কাজেই ঐ বয়সটাকেই তাঁরা লেখা শেখার পক্ষে অনুকূল বলে ধরে নিয়েছেন। শুধু বয়সের কথাই স্মরণ রাখলে চলবে না, ব্যক্তিগত পার্থক্যের কথাটাও মনে রাখতে হবে। একই বয়সে সকলেই যে সমান দক্ষতা লাভ করতে পারবে, এমন নয়। তা'ছাড়া দৈহিক গঠন এবং পৈশিক বৃদ্ধির জন্য হাতের কাজের তারতম্য ঘটতে পারে। তাই লেখা শেখার ব্যাপারে শিশুদের যে কতগুলো ক্ষমতার সমন্বয়ের প্রয়োজন, শিক্ষাবিদরা তার একটা ফিরিস্তি দিয়েছেন। বলেছেন যে, ঐ বিষয়ে কিছু করবার আগে প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, শিশুদের আকৃতি, গঠন এবং শক্তির উপরেই তার লেখার ভালমন্দ নির্ভর করে অনেকখানি। কাজেই দেখতে হবে শিশুর মুঠোর দৃঢ়তা, কব্জির অস্থির সবলতা ও কব্জির সহজ সঞ্চালনের ক্ষমতা, তার স্নায়বিক স্থৈর্য, মনো-সংযোগ, হাতের গতিবিধি, চক্ষু-সঞ্চালন শক্তি—সমস্ত নিয়ন্ত্রিত ও সুসংগবদ্ধ হ'য়েছে কিনা। কারণ ঐ সমস্ত অভ্যাস এবং আরও কতকগুলি প্রক্রিয়া থেকে শিশুদের লেখার অভ্যাস আয়ত্ত হয়।

লেখা শেখার স্বৈচ্ছিক পদ্ধতি ঃ

স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দভাবে আঁচড় কাটাটাকেই অনেকে লেখা শেখার স্বৈছিক পদ্ধতি বলেছেন। চার থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত খেয়াল খুশী মত ছেলেদের হিজিবিজি কাটতে দেওয়া উচিত।

যখন অকারণ দাগ কেটে কেটে ছেলেদের মনে বিরক্তির ভাব জাগবে, তখন এই ছবিগুলো আঁকতে দিতে হবে। যেমন—

৮নং চিত্র



এইভাবে ছবিগুলোতে সোজা রেখা ও ঢেউ দিতে শেখাতে হবে। পেন্‌সিল চালনার কাজে যখন তারা অভ্যস্থ হবে, তখন হিজিবিজি থেকে সহজেই তারা অক্ষরগুলো লিখতে শিখবে।

পেন্‌সিল চালানোর নৈপুণ্য অর্জন ঃ

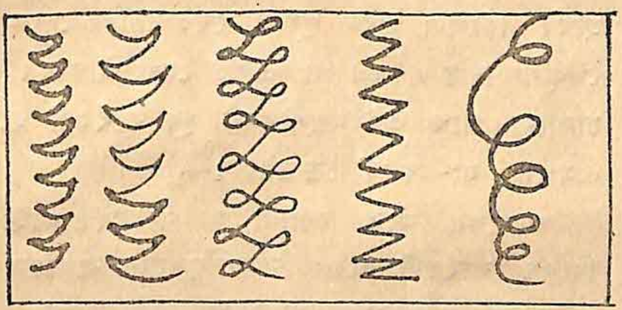
ঠিকমত পেন্‌সিলের ব্যবহার করাটা শিশুদের পক্ষে বেশ একটু কঠিন। কাজেই কখন এবং কিভাবে তাদের পেন্‌সিলের ব্যবহার শেখানো যাবে, সেটাই সমস্যার কথা। এইজন্য অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন যে, প্রথমেই শিশুদের পেন্‌সিলের ব্যবহার না শিখিয়ে যতদূর সম্ভব ছেলেদের হাতে চক্ দিয়ে ইচ্ছেমত বোর্ডে দাগ কাটিতে দেওয়া উচিত, ওতে সহজেই পৈশিক দক্ষতা আসতে পারে। বোর্ডে অথবা খস্‌খসে কাগজে ক্যারিয়নের সাহায্যে ছবি আঁকতে দেওয়া যেতে পারে। তারপর যখন নিপুণভাবে অঙ্গুলী চালনার প্রয়োজন হবে, তখন ক্রমে ক্রমে পেন্‌সিল ব্যবহার করতে দেওয়াই ভালো। এমন কি এ বিষয়ে অভিভাবকদেরও অনুরোধ করা

উচিত, যাতে তাঁরা শিশুদের ঐ ক্ষমতা অর্জনের দিকে লক্ষ্য রেখে সময় বুঝে তাঁরা যেন পেন্‌সিল ব্যবহার করতে দেন। পেন্‌সিল দিয়ে লেখার পূর্বে নিম্নলিখিত রৈখিক অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে পেন্‌সিলের স্বাধীন ব্যবহার শেখানো যেতে পারে। যেমন—

৯নং চিত্র

(ক)

(ক)



হাত দোলানোর ভঙ্গিমা অভ্যাস করানোর জন্য

এই রেখাগুলির উপর ছেলেরা পেন্‌সিল বুলানোর অভ্যাস করবে। রেখাগুলি আঁকার সময় বাঁ দিকে থেকে ডানদিকে বেশ একটা ছান্দিক গতিতে তাদের পেন্‌সিল বুলাতে হবে; এই অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে তাদের পেন্‌সিল চালানোর অভ্যাসটা বেশ আয়ত্ত হবে।

পেন্‌সিল চালানোর অভ্যাসের নির্দেশ ঃ

এক্ষেত্রে অনেকে মন্তেসরির **'মেটাল ইন্‌সেটস'** ব্যবহারের কথা বলেছেন। লেখার প্রস্তুতি ও পেন্‌সিলের ব্যবহার

শেখার পক্ষে বাস্তবিকই ওগুলি অপরিহার্য। জ্যামিতিক আকৃতির মধ্যে বৃত্ত আঁকাটাই অপেক্ষাকৃত সহজ। তাই খাতা বা শ্লেটের উপর গোলাকার কাঠের বা কার্ডবোর্ডের চাকতি বসিয়ে, তার চারিদিকে পেন্‌সিল দিয়ে রেখা টানতে দেওয়া যেতে পারে। বৃত্তটি আঁকা হ'লে, বেশ সোজা সোজা স্পষ্ট রেখায় সেই বৃত্তিটিকে ছেলেদের ভরাট করতে বলতে হবে। ছেলেরা তখন খুব আনন্দেই বাঁ-দিক থেকে ডানদিকে পেন্‌সিল দিয়ে একটির পর একটি রেখা আঁকবে। পেন্‌সিল চালানোর পক্ষে এই অনুশীলনটি খুব কার্যকরী হবে। এই প্রসংগে ৫ নং-এর 'খ' চিত্র দ্রষ্টব্য :—

অনেকের মতে জ্যামিতিক প্যাটার্ণগুলোই এক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী হবে। মনস্তাত্বিকরাও বলেছেন যে, এই ভাবে হাতের ব্যবহার করতে করতে, ছবি আঁকার মধ্যে দিয়ে শিশুদের মনে বস্তুর আকৃতির ছাপ যতই অংকিত হ'তে থাকবে, ততই শিশুরা মন থেকে সেগুলি আঁকতে শিখবে। তখনই বুঝতে হবে যে, ছেলেরা অক্ষরের আকৃতিগুলোও মনে রাখার উপযুক্ত হয়ে উঠেছে। বৃত্তের চারিদিকে বুলানো রেখাগুলো প্রথমে অবশ্য অসমান হবে ; কিন্তু যত-ই তারা দক্ষ হয়ে উঠবে, ততই সেগুলি সুন্দর ও স্পষ্ট হয়ে উঠবে ; এবং ক্রমে ক্রমে ছেলেরা নানা প্যাটার্ণের আমদানি করতে শিখবে। এ পদ্ধতিটি অবশ্য খুব গতানুগতিক। এক্ষেত্রে শিক্ষকের কর্তব্য হবে to help the child in motor action. জ্যামিতিক চিত্রগুলি এ বিষয়ে শিশুদের যথেষ্ট সাহায্য করবে। দ্বিতীয়

কথা হচ্ছে যে, ছবির মাধ্যমেই যেন ছেলেদের লেখা শেখানো হয়। লেখার প্রেরণা পৃথকভাবে না এসে, ছবি-রূপেই যেন শিশুদের কাছে প্রতিভাত হয়। এইজন্য কয়েকজন শিক্ষাবিদ বলেছেন যে, সব সময় শিশুদের যেন স্বেচ্ছিকভাবে ছবি আঁকবার সুযোগ দেওয়া হয়। ছবি আঁকার মধ্যে দিয়ে আসবে পৈশিক সক্ষমতা এবং বৃদ্ধি পাবে পর্যবেক্ষণের শক্তি। লেখা শেখার ব্যাপারে ও দুটোর প্রয়োজনীয়তা বড় কম নয়। এখন দেখা যাক হিজিবিজি থেকে কেমন করে সহজেই ছবি সৃষ্টি করা যেতে পারে। নিম্নলিখিত হিজিবিজি থেকে 'ডিম', 'বল' 'ঘাস' প্রভৃতির ছবিতে রূপান্তরিত করা যেতে পারে, যেমন :—

১০নং চিত্র (ক)



(খ)



সামান্য একটু নির্দেশ দিলেই হিজিবিজি থেকে ছেলেরা ওগুলো অাঁকতে পারবে। এমনি করে ছেলেদের মনে বস্তুর সঠিক আকৃতির ধারণা আসবে। পরিবেশ থেকেই অবশ্য এ চিত্রের ধারণা আসবে। বুদ্ধিমান ছাত্ররা কিন্তু এই সময় থেকেই প্রত্যেকটি রৈখিক আকৃতির নাম আবিষ্কার করতে শিখবে। পিছিয়ে পড়া ছেলেরা অবশ্য 'মেকানিক্যাল' ছবি অাঁকাটাই বেশী পছন্দ করে।

বর্ণময় চিত্র-ই ছেলেরা আঁকতে ভালবাসে। তাদের উৎসাহিত করবার জন্য ছবির সংগে নানা ধরণের ছড়ার আমদানি করা যেতে পারে। ছড়াগুলো অবশ্য হবে, তাদের লেখার বিষয় বস্তুকে নিয়ে। সব সময় আল্‌গাভাবে হালকা রেখায় তাদের ছবি অাঁকতে উৎসাহিত করতে হবে। যাতে ছবি অাঁকার সংগে লেখায় আগ্রহ জন্মায়, সেজন্য নিম্নলিখিত ছড়াটি লিখে দেওয়া যেতে পারে, যেমন :—

কেমন সহজ লেখা ;
অাঁকা বাঁকা রেখা।

অক্ষরের গঠন আকৃতি শিক্ষা :

অক্ষরের গঠন বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণা আসতে একটু সময় লাগে। অক্ষর মিল করা (Letter matching) খেলার মধ্যে দিয়ে ছেলেদের মনে সহজেই অক্ষরের ধারণা দেওয়া যেতে পারে। যেমন ধরা যাক একটি বড় কার্ডবোর্ডে অনেকগুলি

চৌকো ঘর কাটা আছে। এক একটি ঘরের প্রথম সারিতে একটি করে বড় কিংবা ছোট অক্ষর বসানো আছে। প্রত্যেক ঘরগুলিতে অক্ষর বসানোর বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এখন ছেলেদের বলতে হবে, যে ঘরে যে ধরণের অক্ষর আছে, সেই সেই ঘরে পর পর সেই আকারের অক্ষরগুলি বসিয়ে দাও। অমনি ছেলেরা কাটা অক্ষরের বাক্স হাত্‌ড়ে অক্ষরগুলি বার করে সেই সেই ঘরে পর পর অক্ষরগুলো আটকে দেবে।

ঐ সমস্ত বোর্ডে অক্ষর সাজাতে সাজাতে অক্ষরের আকৃতি সম্বন্ধে শিশুর মনে একটা ধারণা আসবে। সঠিকভাবে অক্ষর লাগাতে শিখলে বোর্ডে অনুরূপ ঘর কেটে অক্ষরগুলি না দেখে কোন একটি ঘরে পর পর তা লিখতে বলতে হবে। যেমন 'ক' বা 'অ' অক্ষর নিয়ে তারা নাড়া-চড়া করেছে ; এখন 'ক' বা 'অ' অক্ষরটি তাদের লিখতে দিতে হবে। বড় কি ছোট কোন্ ঘরে লিখতে হবে, সেটা অবশ্য শিক্ষক মহাশয় বলে দেবেন। তাহ'লে দেখা যাবে, কেউ হয় তো অনেকগুলি অক্ষর ঠিক লিখেছে, আবার কেউ কেউ মোটেই পারে নি ; এখন যারা এক দম পারে নি, তাদের, প্রয়োজন হ'লে, আবার ঐ মিল করার খেলা দিতে হবে ; এমন কি ব্যক্তিগতভাবে অক্ষর লেখার কাজে সাহায্য করতে হবে। এইভাবে অল্প দিনের মধ্যে-ই শিশুদের মনে অক্ষরের গঠন বৈশিষ্ট্যের ধারণা আসবে। এক্ষেত্রে অনেকে বলেছেন যে, মন্তেসরির 'এডুকেটিভ্ অকপেশন' কিংবা sand paper letter অক্ষর শেখানোর কাজে বিশেষ কার্যকরী হবে।

লেখা শেখার প্রথম পাঠ ঃ

অক্ষরের আকৃতির কথাটাই প্রথমে আসে। কত বড় বা কত ছোট অক্ষর ছেলেদের শেখাতে হবে। শিক্ষাবিদরা বলেছেন যে, বড় অক্ষরের পরিমাণ হবে অন্তত পক্ষে ৪" এবং ছোট অক্ষরের মাপ ২" হ'লেই চলবে। প্রথমেই বড় হরফের সঙ্গে বড় হরফের এবং ছোট অক্ষরের সংগে ছোট অক্ষরের মিল করতে দিতে হবে। তারপর দেখতে হবে, ছেলেরা কি ধরণের অক্ষর কেমন করে লেখে। যত সামান্য রদবদল করে ছেলেদের লেখা শেখানো যায়, ততই ভাল। সব সময় দেখতে হবে যে, কোন একটা অক্ষর লিখতে শিশুদের খুব অসুবিধা হ'চ্ছে কিনা। যা তারা সহজেই এবং সানন্দে করতে পারে, প্রথমে সেই হরফ লেখায় তাদের হাত পাকাতে দিতে হবে। এই ভাবে অভ্যস্থ হ'লে ক্রমে ক্রমে তারা আরও নূতন অক্ষর লিখতে সচেষ্ট হবে।

প্রথম লেখা ঃ

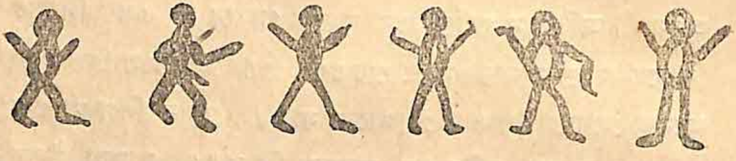
এখন প্রশ্ন হ'চ্ছে কি বিষয় নিয়ে শিশুর প্রথম লেখা সুরু হবে ? তার উত্তরে মনস্তাত্ত্বিকরা বলেছেন যে, some vital word be the starting point. এই অত্যাবশ্যক কথাগুলির তালিকাভুক্ত করা হ'য়েছে, যথা—শিশুর 'নাম', তাদের 'পুতুল', 'খেলনা', 'বিড়াল', 'কুকুর' ইত্যাদি। এছাড়া থাকবে 'জীবজন্তুর বই', যাতে লেখা হবে গরু, বিড়াল, কুকুর ও পাখীর নাম ;

কিংবা ফল ও ফুলের তালিকা। এই সমস্ত যা' কিছুই তারা লিখুক না কেন, প্রথমেই দেখতে হবে তাদের লেখার ইচ্ছা (motive to write) জন্মেছে কিনা। লেখার আগ্রহ প্রবল হ'লে শিশুরা সহজেই অনেক কিছু লিখতে শিখবে, তখন লেখার নির্দেশ পেলে তারা নিজেরাই সচেষ্ট হয়ে নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী অভিধান পর্যন্ত রচনা করতে পারবে। একটু লিখতে শিখলে অবশ্য নানারকম প্রশ্নের ছলে ছেলেদের উৎসাহিত করে অনেক লেখার উপাদান যোগানো যায়। যেমন শিক্ষক প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা ছুটির পর তোমরা কি কর? ছাত্ররা উত্তর দিল, খেলা করি, বাড়ী যাই, খাবার খাই, মাঠে বেড়াই ইত্যাদি। এইবার বোর্ডে সেই কথাগুলি লিখে দিয়ে ছেলেদের ঐগুলি লিখে নেবার নির্দেশ দিতে হবে; কিন্তু যারা মোটেই লিখতে পারবে না, তাদের জন্য একটি খুব সহজ উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। সে অনুশীলনটা হবে মাটির কাজের মাধ্যমে। ধরা যাক, ছেলেদের ৪" চওড়া ও ৬" লম্বা মাটির টালি বানাতে বলা হ'লো, তারপর ছেলেদের মাটির সরু দড়ি পাকাতে বলতে হবে। তারপর শিক্ষক মহাশয় কাঠি দিয়ে সেই টালির উপর সুন্দর করে কতকগুলি সহজ হরফ লিখে দেবেন। তারপর সেই রেখার উপর অক্ষরের আকার অনুসারে মাটির দড়িগুলো সোজা বা বাঁকা করে বসানোর নির্দেশ দিতে হবে। এইভাবে কাঁচা মাটির টালির উপর মাটির দড়ি বসিয়ে ইচ্ছেমত যে কোন অক্ষর বানানোর খেলা করা যেতে পারে।

এছাড়া নিম্নলিখিত ছবির আমদানি করে ছেলেদের জিজ্ঞাসা করতে হবে ১ থেকে ৬ নম্বর ছবির কোন্ ছেলেটি কি করছে লেখ :—

১১নং চিত্র

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬)



অথবা 'অ' দিয়ে কি কি নাম লেখা হবে। ছেলেরা হয়তো লিখলো : অচল, অনল, অজয়, অভয় কিংবা 'আ' দিয়ে লিখলো : আভার মত আবার আমি করবো কাজ; আমার আদুরে পুতুলটিকে পরাবো সাজ; ইত্যাদি। এ থেকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করে লেখার অভ্যাস হবে।

আরও স্বৈচ্ছিক লেখার অভ্যাস :

স্বৈচ্ছিক লেখায় ছেলেরা পোক্ত হ'লে, ক্রমে তাদের কয়েকটি বাক্য লিখতে দিতে হবে। অবশ্য কঠিন অক্ষরগুলো বোর্ডে লিখে দিতে হবে। লেখার সময় ছেলেরা যেন তা' লক্ষ্য করে, তা দেখতে হবে। পরে সেগুলি মুছে দিয়ে তাদের লিখতে বলতে হবে। যা তাদের লিখতে ভাল লাগে, সেগুলি কিন্তু বেশী করে তাদের লিখতে দিতে হবে।

লেখা নকল করবার উপযুক্ত সরঞ্জাম ঃ

ভাল লেখার জন্য ছেলেদের নকল নবিসী করতে হবে কিছুদিন। স্বৈচ্ছিক লেখার পর ভাল ও সুন্দর অক্ষর নকল করতে দিতে হবে। বোর্ডে বা শ্লেটে স্পষ্টভাবে সুন্দর করে যে অক্ষরগুলো লিখে দেওয়া হবে, ছেলেরা সেই হরফগুলির

১২নং চিত্র



'চ' ও 'গ' যুক্ত অক্ষর

১৩নং চিত্র

বিড়াল



উ: কালো উ: ধূসর উ: সাদা

উপর বার বার পেন্সিল দিয়ে বুলাবে। এই সময় বড় বড় হরফে মোটা খাগের কলমে লিখতে দেওয়াই ভাল। লেখার অনুশীলনের জন্য সুন্দর হরফের 'ডিজাইন', মজাদার সহজ ছবি,

সুন্দর বাক্য প্রভৃতি বোর্ডে লিখে দেওয়া যেতে পারে। ছবি নকল করার মত করে ছেলেরা সেগুলি দেখে খাতা বা শ্লেটে তা লিখবে। ছবিগুলো অবশ্য-ই হবে সোজা। এমন লেখা বা নক্সা দেওয়া হবে না, যেগুলি আঁকতে দীর্ঘ সময় লাগে। পূর্ব পৃষ্ঠায় অক্ষরের 'ডিজাইন' এবং কয়েকটি ছবির নমুনা দেওয়া হয়েছে।

ছেলেদের নিজস্ব পুস্তক ঃ

এই সমস্ত ছবি অাঁকা, বাক্য রচনা ও লেখার জন্য প্রত্যেকের একটি আলাদা খাতা থাকবে। নানা ছবি ও লেখায় সেটা যখন পূর্ণ হয়ে উঠবে, তখন সেটা হবে তাদের নিজস্ব বই। পরে সেই বই থেকে কিছু পড়তে ও লিখতে ছেলেরা খুব আনন্দ পাবে। নকল করার সময় ছন্দোময় ঢেউ খেলানো রেখাগুলি নকল করতেই ছেলেরা বেশী ভালবাসে। ছন্দোময় রেখার ছবি, যেমন ঃ—

১৪নং চিত্র



এছাড়া বাগানের গাছপালা, ঘরবাড়ী জিনিষপত্রের নাম লেখার জন্য থাকবে 'ঘরের বই', 'বাগানের' কথা। এই বই

গুলিতে ভাল করে ছবি আঁকতে এবং পরিপাটি করে প্রত্যেকটি জিনিষের নাম ধাম লিখতে ছেলেরা কেবল আনন্দ পাবে না, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে সুন্দরভাবে লিখতে শেখার প্রেরণাও লাভ করবে অফুরন্ত। এইজন্য তাদের হাতের কাজ, ভাষা-শিক্ষা এবং পড়ার নিমিত্ত নিম্নলিখিত পুস্তকের আমদানি করা যেতে পারে, যেমন :—

(১) **তোমার মজার বই**—এতে থাকবে ছেলেদের জানা গল্প, মজার ছড়া, পরিচিত জীবজন্তুর নাম ইত্যাদি। এ সমস্তই ছেলেরা পরস্পর আলোচনা করে লিখবে।

(২) শিক্ষক মহাশয়রা অবশ্য পাঠ্য বিষয়ের নাম লিখে দেবেন ; যেমন 'দুই বন্ধুর কথা' অথবা ঘর কেটে কতকগুলো কথা প্রথম সারিতে লিখে দেবেন, ছেলেরা তার পাশে পাশে লিখবে, যেমন :—

শিক্ষক লিখলেন ছেলেরা লিখল

ঘাস	সবুজ	সাদা	কাগজ
নীল	আকাশ	লাল	......
কালো	কয়লা	হলদে	......

(৩) **কথা ও ছবির বই**—এখানে হরফগুলো ক্রমিক পর্যায়ে সাজানো আছে। এর জন্য বইয়ের সংগে ৭"×১০" ইঞ্চির

লম্বা কাগজ ভাঁজ করা অবস্থায় আঠা দিয়ে লাগানো থাকবে। সেটা হবে ছেলেদের শব্দের তালিকা বা বানান ও শব্দ শেখার অভিধান। নিম্নে একটা তালিকার নমুনা দেওয়া গেল :

অ	আ	ক	খ
অচল	আকাশ	কই	খই
অমল	আউশ	কহিল	খইল
অজয়	আঁইশ	কওয়া	খবর
অভয়	আঁকা	কাঁদা	খচিত
অংশু	আখ	কচু	খরচ
অনুকূল	আংটা	কচুরি	খড়
	আংটি	কড়ি	খড়ম

বানান শেখা :

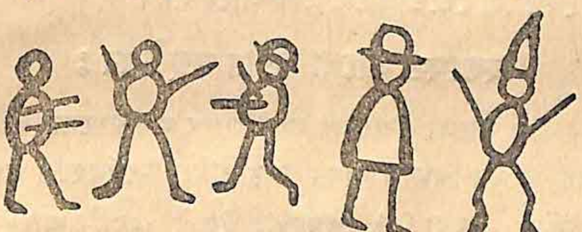
লেখা ও বানান শেখা একই সংগে চলবে। ছেলেরা প্রথমে যে শব্দই লিখুক না কেন, সেটা তারা জোরে জোরে বানান করে-ই লেখে। এই জন্যে লেখা শেখানোর সময় বানান শোখানোর কথাও ভাবতে হবে। বানান ও লেখার ব্যাপারটা অংগাংগিভাবে জড়িত। শিক্ষাবিদরা তাই বলেছেন যে, all writing lessons are really spelling lesson. ৭+বয়সের ছেলেরা ৪০টি শব্দ লিখতে পারে।

ছবির সাহায্যে লেখা ঃ

ছবিই শিশুর প্রথম ভাষা। নানা বিচিত্র ধরণের ছবি গুলোই শিশুদের মনে প্রেরণা যোগায়। কাজেই কতকগুলো ছবিকে কেন্দ্র করে শিশুদের অনুশীলনের জন্য কিছু লিখতে দেওয়া যেতে পারে। নিম্নে শিশুদের আঁকা কয়েকটা ছবির নমুনা দেওয়া গেল। ছবির নীচে প্রশ্ন সম্বলিত আছে। তার নীচে লেখা আছে—ছবি দেখে লেখ, কে কি করছে ?

১৫নং চিত্র

(১) (২) (৩) (৪) (৫)



প্রশ্ন ঃ ১নং ছবির ছেলেটি কি করছে ?

২নং " " কেমন করে দাঁড়িয়ে আছে ?

৩নং " " মাথায় কি দিয়েছে ?

৪নং " " গায়ে জামা দিয়েছে কি ?

৫নং " " কি করছে বল তো ?

এর উত্তরগুলো ছেলেরা খাতায় লিখবে। এই ধরণের নানাবিধ ছবির আমাদানি করে ছেলেদের লেখার উৎসাহ সহজেই বাড়ানো যেতে পারে।

ছাপা ও টানা লেখা শিক্ষা ঃ

ছাপা লেখার অনুকরণ করাটাই ছেলেদের পক্ষে সহজ। কারণ সেগুলো প্রায় সোজা, ছোট এবং কোথাও কোথাও সামান্য একটু বাঁকা রেখার সমষ্টি। সেগুলো লিখতে শিশুদের খুব বেশী বেগ পেতে হয় না। কাজেই প্রথম শিক্ষার্থীকে মোটা ও বেশ বড় হরফে খাগের কলমের সাহায্যে লিখতে দেওয়া উচিত। ছাপার অক্ষরগুলো অনুকরণ করে লেখার পর যখন ছেলেদের বেশ পৈশিক দক্ষতা আসবে, যখন তারা দাগ না টেনেই পরিষ্কার ভাবে লিখতে শিখবে। তখনই তাদের টানা লেখা শেখানো যেতে পারে, তার আগে নয়।

হস্তাক্ষর ভালো করার অনুশীলন ঃ

হস্তাক্ষর ভালো করানোর জন্য বিশেষ অনুশীলনের দরকার। কাজেই লিখন-শিক্ষার সময় নিম্নলিখিত নির্দেশগুলি অনুসরণ করা উচিত। যথা (১) শিক্ষকের তৈরী একটি আদর্শ হস্ত-লিপির খাতা থাকা দরকার। (২) লিখন-শিক্ষার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম থাকা উচিত। (৩) প্রত্যহ প্রত্যেকটি ছাত্রের হাতের লেখা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। (৪) সময় অভাবে সংশোধন করা যাবে না, এমন বেশী লেখানো উচিত নয় (৫) দেখতে হবে লেখার মধ্যে যেন এতটুকু অযত্ন না থাকে (৬) ছেলেদের খারাপ অক্ষরগুলি বার বার সংশোধন করে দিতে হবে (৭) ব্ল্যাকবোর্ডে সুন্দর করে লিখে দিতে হবে (৮) শিশুদের নিজস্ব আদর্শলিপির খাতা থাকা দরকার (৯) নিয়মিত এবং রীতিমত অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

॥ কথন-শিক্ষা ॥

Speaking is an art of expression.

৺

কথার মধ্যে এমন একটা যাদু আছে, যা মনকে অভিভূত করে হৃদয়কে কেড়ে নেয়।

৺

কথাটা মনের ফটোগ্রাফ নয়, ছবি। তার মধ্যে হৃদয়ের রঙ, ভাবনার আলো ছায়া একাকার হয়ে থাকে, তাই কথা শেষ হয়েও, শেষ হয় না।

৺

তুমি গলা ফাটিয়ে চীৎকার করলেও ক'জন তোমার কথা শোনে? অথচ যে জাত কথা বলিয়ে, তার কোনদিন শ্রোতার অভাব হয় না।

৺

কথার মধ্যে হুলও আছে, মধুও আছে।

৺

He who can speak
clear and well,—
He can tackle the situation
and hit the target nail.

কখন যে প্রথম শিশুর কথা ফোটে, তাহা সঠিকভাবে বলা যায় না। বাক্‌স্ফূর্তির বাঁধা ধরা কোন বয়স নেই। তবে একথা ঠিক যে, মাস ছ'য়েকের পূর্বে কিন্তু শিশুর বাক্‌স্ফূর্তি ঘটতে দেখা যায় না। অতি শৈশবেই কোন কোন শিশু দিব্যি কথা কইতে শেখে, অনেকে আবার অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সেও ঠিক মত কথা বলতে পারে না। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, ছয় থেকে দশ মাসের মধ্যে শিশুরা মা বাপের কথার অর্থ বেশ বুঝতে শেখে এবং ভাঙা ভাঙা ছু' একটা শব্দও উচ্চারণ করতে আরম্ভ করে। প্রথম দিকে পাখী পড়ানো করেই শিশুদের কথা কইতে শেখানো হয়। বহু সাধ্য সাধনার পর ছু' একটি শব্দ যা' সে উচ্চারণ করতে পারে, সে তাই তোতা পাখীর মত আবৃত্তি করে। অসংলগ্ন অসংগত কথা সময়ে অসময়ে ক্রমাগত বলতে বলতে শিশুর জিভের জড়তা কাটে ; শিশুরা কথা কইতে শেখে। বছর তিনেকের মধ্যেই কথা বলাটা শিশুরা বেশ খানিকটা রপ্ত করে ফেলে। অবশ্য বিকলাংগ বা একেবারে নিরেট ধরণের শিশু না হ'লে, কয়েক বছরের মধ্যেই স্বাভাবিক সুস্থ শিশুর মুখে কথার খৈ ফুটতে আরম্ভ করে। অস্বাভাবিক শিশুদের কথা স্বতন্ত্র। শিশুদের এই কথা বলার

কথা বলার বয়স

বিলম্বিত কথন

ব্যাপারটা এমন স্বাভাবিক এবং দ্রুত গতিতে পরিণতি লাভ করে যে, আমরা সব সময় ঠিক করে উঠতে পারি না, কখন শিশু প্রথম কথা বলেছিল ; অথবা কোন্ বয়সে কেমন করে তা'র ভাষা-জ্ঞান জন্মাল।

তা' ছাড়া পিতামাতাকে কোনরূপ ভাববার অবকাশ না দিয়েই দম দেওয়া গ্রামোফোনের মত শিশুরা যখন অনর্গল কথা কইতে আরম্ভ করে, প্রশ্নের পর প্রশ্ন বাণে অতিষ্ঠ করে তোলে—তখন বিস্ময়ে আনন্দে অভিভাবকদের মন ভরে উঠে। তাঁরা জানতেও চান না শিশুরা কি কি কথা বলে, কোন্ কথার অর্থ তারা বোঝে, অথবা তাদের শব্দ-সম্পদই বা কতটুকু বাড়লো। কাজেই শিশুদের এই দিকটা অনেক সময় আমাদের কাছে অজ্ঞাতই থেকে যায়। শিশুদের সংগে প্রথম যাদের সম্পর্ক,—যাঁদের মধ্যেই অতিবাহিত হয় শিশুর শৈশব—সেই অভিভাবকেরা তাদের এত কাছে পেয়েও, তাদের মনের খোঁজ রাখেন না। আর শিশুদের নিয়ে যাদের কাজ-কারবার, সেই শিক্ষকেরাও যে স্বল্প সময়ের জন্যে তাদের কাছে পান, তাতে শিশুর সমগ্র জীবনের কোন খবরই মেলে না! কাজেই শিশুর জীবন-রহস্য এবং মনস্তত্ত্ব তাদের অজানাই থেকে যায়।

পরিবেশ, গৃহ ও বিদ্যালয়

ফলে শিশুর কথন-শক্তি পরিস্ফুট হওয়ার কথাটা জানার অবকাশ আমরা পাই না। কারণ প্রাক্-কথন অবস্থা থেকে শিশুদের পর্যবেক্ষণ না করলে, শিশুর কথনোত্তর জীবনের

সঠিক ধারণা করা যায় না। আমরা সাধারণতঃ নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যে সমস্ত ছাত্র পাই, তারা প্রত্যেকেই অল্প বিস্তর কথা কইতে পারে। শব্দ-সম্পদ ও ভাষাজ্ঞান কিছুটা যে তাদের না আছে, এমন নয়। কাজেই তাদের বাক্‌স্ফূর্তি আমাদের অলক্ষ্যে ঘটলেও শিশুর কথন-শক্তি বিকাশের দিকে আমরা সজাগ দৃষ্টি রাখতে পারি। এ জন্যে অবশ্য বিভিন্ন বয়সের শিশুদের নিয়ে গবেষণা-মূলক পরীক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন।

বাক্‌স্ফূর্তির সঠিক ধার

খেলার ছলে যে কি সহজ ও স্বাভাবিক উপায়ে কেমন করে শিশুদের কথনশক্তি বাড়ানো চলে, এ ক্ষেত্রে সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করবো। তার আগে কথা বলার মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধেও দু'চার কথা—জানতে হবে। এখন প্রশ্ন হ'চ্ছে এই যে, শিশুর প্রথম অভিব্যক্তি কিসে রূপ পায়—ভাষা না ইংগিতে? শিশুর আদিম ভাষা অবশ্য ইংগিত-ধর্মী। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর অনেক দিন পর্যন্ত এক কান্না ছাড়া অন্য কোন ভাষাই শিশুর থাকে না। আঘাত লাগলে বা ক্ষুধা পেলেই শিশুরা কাঁদে, যদিও ও-দুটোর অনুভূতি সম্পূর্ণ পৃথক।

প্রথম ভাষা ইংগিত ধর্মী

যখন থেকে শিশুরা মা, বাপ বা আত্মীয়স্বজনের কথা কিছুটা বুঝতে শেখে, তখন থেকেই সুরু হয় তা'র সাংকেতিক ভাষা। শিশুকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেই সে ইংগিতে তা' দেখিয়ে দেয়। এই পরিচিতি বোধটি প্রথম দিকে শিশুর নিজ

নিজ অংগ প্রত্যংগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। পরে বস্তু থেকে বিষয়ান্তরে তা ক্রমে ক্রমে সংক্রমিত হয়।

সাঙ্কেতিক ভাষার প্রয়োগ

ইংগিত-ধর্মী ভাষাতেই শিশুর নানা সংকেত মূর্ত হয়ে উঠে, যেমন—কোন শিশুর অংগ প্রত্যংগের কথা জিজ্ঞাসা করলে, শিশুরা তা' সহজেই দেখিয়ে দেয়। অল্প বয়স থেকেই শিশু তার চোখ কান নাক মুখ প্রভৃতি দেখিয়ে দিতে পারে। তা' ছাড়া, 'খুকু তোমার পুতুল কৈ ?' এ কথা জিজ্ঞাসা করলেই, খুকু সানন্দে এবং নিঃশব্দে তার নিজের পুতুল দেখায়। এমনি করে সাংকেতিক ভাষা থেকে শিশু কথা বলার অভ্যাস আয়ত্ত করে। এই তো গেল কথা বলার প্রথম প্রেরণার কথা।

এখন কথা বলার স্বাভাবিক অনুরাগের কথায় আসা থাক। শিশুমাত্রই কথা কইতে ভালবাসে। কথা বলার

কখন অনুরাগ জন্মে

মধ্য দিয়ে শিশুর নিরুদ্ধ হৃদয়াবেগ, নানা চিন্তা এবং অভিব্যক্তি প্রকাশের পথ খুঁজে পায়। কাজেই কথা বলার সুযোগ না পেলে, শিশুর স্ফুটনোন্মুখ চিত্তবৃত্তিগুলি যে ক্ষুণ্ণ হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই কথা বলাটা শিশুর স্বাভাবিক ধর্ম হ'লেও, কথা বলার সময় শিশুরা অনেক অবান্তর অর্থহীন কথাও বলে। পরিবেশের প্রেরণায় যখন শিশুর সমস্ত সংকোচের বাঁধ ভেঙে যায়, তখন শিশুর কথায় জোয়ার আসে। কাজেই সে কল্পনা-মুখর উচ্ছ্বাসের মাঝে কথা বলাটাই শিশুর কাছে মুখ্য হয়ে উঠে, তাই অর্থহীন কথার কোন

অসংগতিই বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। এইজন্যে কথা বলার উন্মাদনা সকল সময় কিন্তু ব্যাকরণ মেনে চলে না! তাই দেখা যায় যে, কথার সব অর্থ না জেনেও শিশুরা অনেক কথাই ব্যবহার করে।

প্রেরণা

কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে, কথা বলার প্রথম প্রেরণা আসে শিশুর পরিবেশ থেকে। আজন্ম যে আবেষ্টনীর মধ্যে শিশু মানুষ হ'য়েছে, শিশুর কথায়, গল্পে তার প্রতিধ্বনি থাকবেই। কারণ শিশু-জীবনে তার পরিবেশের প্রভাব অপরিহার্য। ফলে শোনা কথা আর অভিজ্ঞতার বাইরে শিশুর অন্য কোন কথা নেই। প্রথম বাক্‌স্ফূর্তির পর থেকেই শিশু প্রতিনিয়ত যা' শোনে, তার পরিবেশের মধ্যে যে যে কথা হয়, শিশুর কথোপকথনে তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। তাই কোন একটি শিশুর কথা শুনলেই, টের পাওয়া যায় যে, সে কোন্ সমাজের বাসিন্দা। কারণ আমরা জানি speech is the index of his social environment. এইজন্যে দেখা যায় যে শিক্ষিত পরিবারের শিশুদের ভাষা জ্ঞান অপেক্ষাকৃত বেশী; রুচি পরিমার্জিত এবং শব্দসম্পদও সমধিক। দরিদ্র অশিক্ষিত সমাজের শিশুদের ক্ষেত্রে কিন্তু ও দু'টোরই যথেষ্ট দৈন্য দেখা যায়। ফলে আমরা দেখতে পাই যে, বস্তির ছেলে মেয়েরা যে বয়সে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করতে শেখে, সেই বয়সে শিক্ষিত ঘরের ছেলেরা আবৃত্তি করতে আরম্ভ করে ছড়া আর কবিতা।

গৃহ পরিবেশের পরই বিদ্যালয়ের কথা উঠে। বিদ্যালয়ের সমবয়সী ছাত্র, শ্রেণী-পরিবেশ এবং শিক্ষকই শিশুর অভিজ্ঞতায় নিত্য নূতন রঙ ফলায়। ছাত্র-জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা শিশু-কল্পনার রসদ যোগায়। সমবয়সী সাথী আর শিক্ষকের সঙ্গে শিশুরা কথা বলার অজস্র সুযোগ পায়। কাজেই বিদ্যালয়ই শিশুদের কথোপকথন শিক্ষার বৃহত্তর ক্ষেত্র। সেখানে নানা অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিশুর ভাষাজ্ঞান ও কথন-শক্তি যা'তে স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করে, সে দিকে শিক্ষকদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে; তাই কথন-শিক্ষার গোড়ার কথাই হচ্ছে শিশুদের কথা বলার অফুরন্ত সুযোগ দেওয়া। সে জন্যে শুধু যে কথা বলার অবাধ স্বাধীনতা দিলেই চল্‌বে তা নয়, শ্রেণীপরিবেশকেও সর্বতোভাবে কথা বলার অনুকূল করে তুলতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রেণীকক্ষে এমন সব সাজ-সরঞ্জাম আর চিত্র রাখতে হবে, যেগুলির জন্যে শিশুর মনে জাগবে নানা প্রশ্ন, জানার কৌতূহল মুখর করে তুলবে তার ভাবনাকে। তা' ছাড়া শিক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাব-গুণেও শিশুরা দিব্যি কথা বলতে শেখে।

কথন শক্তির বৃদ্ধি

কাজেই শিশুদের কথন-শক্তি বাড়াতে হ'লে প্রত্যেক শ্রেণীতেই শিশুদের বাক্-স্বাধীনতা দিতে হবে। বিশেষ করে লেখা পড়ার সময় যতদূর সম্ভব প্রশ্নোত্তর করার সুযোগ দিতে হবে শিশুদের। শিশু-শ্রেণীতে শিক্ষকদের দায়িত্ব হবে শুধু কথা দিয়ে কথা আদায় করা। এইজন্যে শিশুদের মধ্যে যাতে

কোনরূপ সংকোচ না থাকে, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। কোন ক্ষেত্রে ছাত্রদের মধ্যে কোন সংকোচ বা দ্বিধা থেকে গেলে, অবাধ মেলা-মেশার দ্বারা ছাত্র শিক্ষকের মাঝের সেই দূরত্বটুকু দূর করে দিতে হবে। তা' হ'লে শিক্ষকেরা সহজেই শিশুর মনের কথা টেনে বার করতে পারবেন; তারাও নিঃসংকোচে অকপটে সমস্ত কথাই বলতে পারবে শিক্ষকের কাছে। ফলে ব্যবধান ঘুচবে, কথা বলার সাহস বাড়বে, স্বচ্ছন্দ হবে শিশুর বাচন-ভংগী। যে কোন উপায়ে শিশুরা একবার তাদের সংকোচ কাটিয়ে উঠতে পারলে, শিক্ষকের সান্নিধ্যে এসেই তারা প্রাণ খুলে কথা বলবে। ফলে শিক্ষকেরা সহজেই শিশুদের কথন-ক্ষমতা সম্বন্ধে সঠিক কথা জানতে পারবেন। তা' ছাড়া কথা বলার মাঝে উচ্চারণ বা ভাষাগত কোন দোষ ত্রুটি থাকলে শিক্ষকেরা তখনই তা' সংশোধন করিয়ে দিতে পারবেন।

শিশুরা যাতে ভালভাবে কথা বলতে শেখে, বাক্‌স্ফূর্তির গোড়া থেকেই সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যখনই যার সংগেই কথা বলুক না কেন, তারা স্পষ্ট নির্ভুল ভাষায় কথা বলে কিনা, সে দিকে একটু খেয়াল রাখতে হবে। সম্ভব হ'লে কথা বলার সংগে সংগে শিশুদের কথা বলার ভুলচুকগুলি সংশোধন করে দিতে পারলে ভাল হয়। অনেক সময় শিশুদের আধো আধো অস্ফুট কথা শুনতে বেশ মিষ্টি লাগে, তাই বলে সেই অস্পষ্ট ভাষায় কথা বলার জন্যে শিশুদের উৎসাহ দেওয়াটা ঠিক নয়। সে সময় বরং এ

কথাই চিন্তা করতে হবে যে, কেমন করে সেই আধো আধো বোলকে কথন-ক্ষমতায় রূপান্তরিত করা যায়। সে জন্যে অবশ্য নিম্নলিখিত সংশোধন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে :—

পদ্ধতি

(১) প্রথম থেকেই শিশুদের সুষ্ঠু ভাষায় কথা বলতে শিক্ষা দিতে হবে।

(২) কথা বলার মাঝে শিশুদের ভুল সংশোধন করিয়ে দিতে হবে।

(৩) ভাষা প্রকাশের জন্য শব্দ নির্বাচন ও বাক্য-বিন্যাস শিক্ষা দিতে হবে (Selection of words, arrangement of sentences and expression)

উদ্দেশ্য

আত্ম-প্রকাশই 'কথন-শিক্ষার' প্রধান উদ্দেশ্য। শিশুর আত্ম-প্রকাশের ক্ষমতা যাতে বাড়ে, তার কথা-বার্তা, আচার-আচরণে যাতে কোন জড়তা না থাকে—সেদিকে প্রথম থেকেই দৃষ্টি দিতে হবে। ভাষার দৈন্য এবং আত্ম-প্রকাশের সংকোচ—এ দুটোই হ'চ্ছে শিশুদের বাক্‌স্ফূর্তির প্রধান অন্তরায়। কাজেই কোন উপায়ে ওদু'টো অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে পারলেই যে শিশুদের কথন ক্ষমতা স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই জন্যে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিশুদের কথা বলার অবাধ সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য নিম্নলিখিত সুব্যবস্থার আয়োজন করা যেতে পারে :—

১। খবর বলা

(ক) কৃত্রিম টেলিফোনের সাহায্যে

(খ) বক্তৃতা-মঞ্চে

(গ) কৃত্রিম মাইকের সাহায্যে

(ঘ) নিউজ-টেবিলে

(ঙ) ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে

২। গল্প বলা

৩। বিতর্ক সভা

৪। নাটক অভিনয়

৫। আবৃত্তি

৬। নাচ গান প্রভৃতি

প্রত্যেক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কার্যসূচীতে খবর বলার জন্যে সময় নির্দিষ্ট আছে। সেই নির্ধারিত সময়ে পালাক্রমে প্রত্যেকটি শিশুকেই নিজ নিজ অভিজ্ঞতা অনুযায়ী খবর বলার সুযোগ দেওয়া হয়। শিশুরা প্রতিদিন যা' যা' দেখে অথবা তাদের পরিবেশের যে ঘটনা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—এমনতর নানা খবর সংগ্রহ করে তারা তাদের বন্ধু-বান্ধবদের কাছে পরিবেশন করে। এইভাবে প্রত্যহই তাদের নানাবিধ হাল্কা আলাপ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হয়। এই খবর বলার ক্লাসটিকে গতানুগতিক ভাবে পরিচালিত না করে নিত্য নূতন পরিকল্পনার সাহায্যে সুনিয়ন্ত্রিত করতে পারলে শিশুদের আগ্রহ ও উৎসাহকে অক্ষুণ্ণ

রাখা যায় ; ফলে সহজেই খবর বলার উদ্দেশ্য সফল হয়। এই জন্যে মাঝে মাঝে ছেলেদের উৎসাহিত করে বিভিন্ন স্থানের ভাল ভাল খবর এবং তথ্য সম্বলিত মজার সংবাদ সংগ্রহ করানো যেতে পারে। ছেলেরা এই সমস্ত মজার খবর সংকলন করে প্রত্যহ তাদের নিজ নিজ খাতায় লিপিবদ্ধ করবে। তাদের মধ্যে যার খবর অভিনব ও মুখরোচক বলে মনে হবে, সেই খবর তাদেরই ফলাও করে বলতে দেওয়া হবে। আর যারা খবর বলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে, তারা ঐ গৌরব অর্জনের জন্য আবার ভাল ভাল খবর সংগ্রহে সচেষ্ট হবে। এইভাবে খবর বলা ও সংগ্রহের প্রতিযোগিতা চল্লে, শিশুরা পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে।

(ক) এ ছাড়া কৃত্রিম টেলিফোনের সাহায্যে খবর বলার ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হয়। দুটি খালি দেশলাইয়ের খোল একটি দীর্ঘ সূতোর উভয় প্রান্তে বেঁধে—সংবাদ-প্রেরণ ও গ্রহণের অনুরূপ টেলিফোন যন্ত্র প্রস্তুত করতে হবে। ছেলেরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে সংবাদ প্রেরণ ও গ্রহণের কাজ করবে। যে দল সংবাদ প্রেরণ করবে, তারা অনেকটা দূর থেকে দেশলাইয়ের খোলে মুখ দিয়ে আস্তে আস্তে খবর পাঠাবে। দেশলাইয়ের খোলের সংগে সংলগ্ন সূতোর মাধ্যমে সেই কথার স্পন্দন গিয়ে পৌঁছুবে অপর প্রান্তের দেশলাইয়ের খোলের রিসিভারে ; সেই রিসিভারে কান লাগিয়ে সংবাদ-গ্রাহক যে খবর পাবে, তা' সে বন্ধুদের কাউকে লিপিবদ্ধ করতে বলবে এবং তার সাথীদের একজন তা' লিখে নেবে।

এইভাবে পালাক্রমে খেলার মাধ্যমে শিশুদের শ্রবণশক্তি, কল্পনা ও কথা বলার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

(খ+গ) খবর বলার দ্বিতীয় উপকরণ হ'চ্ছে বক্তৃতামঞ্চ স্থাপন। সম্ভব হ'লে একটি কাষ্ঠদণ্ডের উপর এমনভাবে একটি টিনের চোঙ্ খাটাতে হবে, যা' কৃত্রিম মাইকের কাজ করবে। টেবিল চেয়ার দিয়ে বেশ কেতাদুরস্তভাবে বক্তৃতামঞ্চ সাজাতে হবে। বক্তৃতামঞ্চের সমস্ত আয়োজন শেষ হ'লে বিতর্ক-সভার বন্ধুরা দু' দলে বিভক্ত হ'য়ে নিজ নিজ সংরক্ষিত আসন গ্রহণ করবে। তারপর ছেলেরা নিজেদের মধ্য থেকে সভাপতি ও প্রধান বক্তাদের নির্বাচিত করবে। এই প্রাথমিক নির্বাচন-পর্বটা চুকে গেল, সভার কাজ আরম্ভ হবে। কাজের সুবিধার জন্য বক্তাদের নির্বাচিত করে রাখাই ভাল। বক্তৃতার বিষয় বোর্ডেও লিখে দেওয়া যেতে পারে। সভার কাজ আরম্ভ হ'লে প্রথম বক্তা উঠে আলোচ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করবে। তার বক্তব্য শেষ হলে বিরোধী দলের নেতা বক্তৃতা দিতে উঠবে। এইভাবে বাদানুবাদের মধ্য দিয়ে ছেলের তার্কিক-বুদ্ধি ও কথন-শক্তি অতি সহজেই পরিণতি লাভ করবে। এই পদ্ধতি অবশ্য চতুর্থ অথবা পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রদের উপযুক্ত হবে। বিতর্ক-সভা ছাড়াও সাধারণ যে কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে বক্তৃতা-সভার আয়োজন করা যেতে পারে।

(ঘ) এ ছাড়া ঘরোয়া আলাপ আলোচনার জন্য থাকবে 'নিউজ টেবিল'। এই সব বৈঠকে ছেলেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হ'য়ে মজলিসী গল্প আর নানা পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা

করবে। নিউজ টেবিল নানাবিধ চিত্র, খেলার উপকরণ, ছবির বই ও সাজ-সরঞ্জামে সাজনো থাকবে। যে কোন ছাত্রের জন্মতিথি, পুতুলের বিয়ে, বনভোজন প্রভৃতি কোন একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে ছেলেরা উৎসবের আয়োজন করতে পারে। কাজের সুবিধার জন্য এইসব বৈঠকী আলোচনায় ছেলেরাই ঠিক করবে কি কি কাজ করতে হবে, পরে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা কাজ করবে। এইভাবে শিশুদের কাজের দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগ দিলে তারা সহজেই একটি মৌলিক পরিকল্পনাকে কাজে রূপায়িত করতে পারবে।

(ঙ) আর যদি সম্ভব হয়, তা'হলে ছেলেদের জন্যে ম্যাজিক লণ্ঠনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ছবিগুলি যখন পর্দায় প্রদর্শিত হবে, তখন ছেলেদের মধ্য থেকেই দু'একজন বক্তা সেই ছবির বিষয় সবিস্তারিতভাবে তার ছাত্র-বন্ধুদের কাছে বুঝিয়ে বলবে। এর জন্যে ছেলেরাই ভোটের দ্বারা ছাত্র-প্রতিনিধি নির্বাচিত করবে। শিশুদের ম্যাজিক লণ্ঠনের বিষয়গুলি অবশ্য হবে শিশুর পরিচিত পরিবেশ থেকে নেওয়া, অথবা তাদের জানা কাহিনী কিংবা জীবজন্তুর কথা থাকবে সেই সমস্ত চিত্রে। তা' না হ'লে শিশুর পক্ষে ছবির অর্থ উদ্ধার করা সম্ভবপর হবে না।

এ ছাড়া গল্পবলা, নাটক অভিনয়, আবৃত্তি, নাচ গানের সাহায্যেও শিশুদের সংকোচ, কথা বলার জড়তা কাটিয়ে তোলা যায় এবং নির্ভুলভাবে শিশুদের কথা বলা ও বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

বক্তৃতা করার সময় অথবা কোন কিছু বলার সময় শিশুদের নিম্নলিখিত নির্দেশগুলি তামিল করবার হুকুম দিতে হবে ঃ—

(১) সোজা হ'য়ে দাঁড়াও

(২) পকেটে হাত দিও না

(৩) কথা বল

(৪) তাড়াতাড়ি করো না

এই নির্দেশগুলি মেনে চল্‌লে শিশুরা ভালভাবে কথা বলার পদ্ধতি রপ্ত করতে শিখবে। খবর বলার মধ্য দিয়ে শিশুরা সুসংলগ্ন কথা বলার অভ্যাস আয়ত্ত করবে।

ছেলেদের দিয়ে খবর বলানোর প্রধান উদ্দেশ্য হ'চ্ছে তাদের কথন-ক্ষমতা বাড়ানো এবং কথার দোষত্রুটি সংশোধন করিয়ে দেওয়া। শিশুরা যাতে স্বভাব-সুলভ সংকোচ কাটিয়ে দু'কথা গুছিয়ে বলতে পারে, সেদিকে শিক্ষকদের বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। সেজন্য খবর বলার ক্লাসে শিশুদের বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং সম্ভব হ'লে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার দ্বারা সেগুলির সংস্কার করতে হবে ঃ—

(১) ব্যক্তিগত অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।

(২) শারীরিক বিকৃতি-জনিত কোন অসুবিধা না থাকলে, অবশ্য শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ ও সংশোধনাত্মক খেলার দ্বারা তার সংস্কার করা যেতে পারে।

(৩) কথা বলার সময় শিশুদের দোষত্রুটিগুলি লক্ষ্য করে প্রতি মুহূর্তে সে ভুল সংশোধন করতে যাওয়াটা ঠিক নয়।

এখন শিশুদের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা নিয়ে আলোচনা করা যাক। এখন প্রশ্ন হ'চ্ছে কি কি কারণে শিশুরা ঠিক মত কথা বলতে পারে না, তার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করা। কারণগুলি আবিষ্কার করতে পারলে অবশ্য, সংশোধন-পর্বটা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। এজন্যে শিশুদের সংগে প্রাণ খুলে মিশতে হবে। Informal আলোচনার মধ্য দিয়ে কথায় কথায় জানতে হবে, কথা বলার মধ্যে শিশুদের কি কি মুদ্রাদোষ আছে ; সব কথা তারা ঠিক মত উচ্চারণ করতে পারে কি না, কোন্ কোন্ শব্দ উচ্চারণে আঞ্চলিক দোষ-ত্রুটি আছে— সে বিষয়ে শিক্ষকদের বিশেষভাবে অবহিত হ'তে হবে।

আংগিক বিকৃতি-জনিত ত্রুটিগুলি সংশোধন করাটা কিন্তু খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। কাজেই ঐ ধরণের কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলেই, তৎক্ষণাৎ কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া উচিত। কি কি বিকৃতি-জনিত কথা বলার ত্রুটি ঘটে, তা একটু চিন্তা করে দেখা উচিত।

আংগিক বিকৃতি-জনিত ত্রুটি ঃ

(১) শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের দোষ-জনিত অসুবিধা

(২) ওষ্ঠ সঞ্চালনের দোষ

(৩) আল্‌জিভ ও জিভের বিকৃতি

(৪) কতকগুলি বিশেষ শব্দ উচ্চারণের অক্ষমতা (যেমন 'স', 'শ'' 'ষ', 'র', 'ট', 'ঠ', প্রভৃতি)

(৫) আঞ্চলিক অশুদ্ধ উচ্চারণের প্রভাব যেমন করিয়া'র স্থানে কইরা, জিজ্ঞাসিয়া'র স্থানে জিগাইয়া প্রভৃতি।

(৬) কণ্ঠনালীর দোষ (defect of vocal organ)

কোন মারাত্মক আংগিক ত্রুটি না থাকলে, প্রথম দু'টি অসুবিধা অবশ্য নিম্নলিখিত উপায়ে সংশোধন করা সম্ভব বলে মনে হয়। প্রথমতঃ হ'চ্ছে শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ আর দ্বিতীয়তঃ হ'চ্ছে হাসির ব্যায়াম। প্রক্রিয়া দু'টো একটু অদ্ভুত বলে মনে হ'লেও, ব্যাপারটা আসলে কিন্তু খুব সহজসাধ্য। শ্বাস নিয়ন্ত্রণ প্রণালীর উদ্দেশ্য এই যে, সময় মত শ্বাস গ্রহণ করা এবং ত্যাগ করার সু-অভ্যাস গঠন করা। ঘড়ি ধরে সম্ভব না হ'লেও সংখ্যা গণনার নির্দেশ অনুসারে ঐ অভ্যাস করানো চলে। যেমন ছেলেদের সোজা হ'য়ে দাঁড়াবার নির্দেশ দিয়ে বলতে হবে—

এক দুই শ্বাস নাও ;
তিন চার ছেড়ে দাও।

অনুরূপ উপায়েই কৃত্রিম হাসির ব্যায়াম করানো যেতে পারে। হাস্য রস পরিবেশনের দ্বারা স্বাভাবিক ভাবে হাসাতে পারলে তো খুব-ই ভাল, নইলে ছেলেদের হাসার নির্দেশ দিয়ে বলতে হবে—'হাসো'! কথাটা শোনা মাত্রই ছেলেরা এক যোগে 'হোঃ হোঃ' করে হেসে উঠবে, অমনি তাদের থামবার হুকুম দিতে হবে। এইভাবে হাসির ব্যায়ামের দ্বারা ছেলেদের ঠোঁট ও জিভের জড়তা কিছুটা কাটানো যায়।

কথা বলার জড়তা দূর করানোর প্রধান উপায় কথা বলার অবাধ সুযোগ দেওয়া। সেই জন্যে খবর বলার ক্লাসে—

(ক) যত দূর সম্ভব ছেলেদের কথা বলার সুযোগ দিতে হবে।

(খ) যে পরিবেশ শিশুদের কথা বলার প্রেরণা যোগায় তার অবতারণা করতে হবে।

(গ) শিশুদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত ক'রে নানা বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছন্দে কথা বলতে দিতে হবে।

ভাষা-শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারেও ঐ ধরণের খেলার মাধ্যমেও জিভের জড়তা অতি সহজেই দূর করা যায়। এমন কতকগুলি শব্দ পাশাপাশি সাজিয়ে ছেলেদের দিয়ে বলাতে হবে, যে কথাগুলি তাড়াতাড়ি ঠিক মত উচ্চারণ করা যায় না, জিভের জড়তার জন্য তাল গোল পাকিয়ে যায়। সেই ধরণের অনেক শব্দ পাশাপাশি সাজিয়ে ছেলেদের আবৃত্তি করতে বলতে হবে। ছেলেদের দুটি দলে বিভক্ত করে সেই কথাগুলি একে একে আবৃত্তি করতে বলতে হবে, যে দল যত কম ভুল করবে, তারা-ই জয়ী হবে। নমুনা স্বরূপ নিম্নে কতকগুলি কথা দেওয়া গেল—

(ক) চাচা চাঁচা চটা চাঁচো না চাচা, আচাঁচা চটা চাঁচো?

(খ) বাব্‌লা গাছে বাঘ বেঁধেছি (তাড়াতাড়ি ও জোরে জোরে বলাতে হবে)।

(গ) তেলে চুল তাজা, জলে চূণ তাজা।

এ ছাড়া 'ট' 'ঠ' 'ক' ইত্যাদি শব্দগুলিও অনেক সময়

শিশুরা ঠিক মত উচ্চারণ করতে পারে না ; কাজেই ঐ সমস্ত শব্দ দিয়ে আরম্ভ কতকগুলি ছড়া বা কবিতা ছেলেদের বার বার আবৃত্তি করতে বলতে হবে। সেগুলি উচ্চারণ করার সময় মাঝে মাঝে সংশোধন করিয়ে দিতে হবে। এইভাবে শব্দগুলি ক্রমাগত উচ্চারণ করতে করতে শিশুরা জিভের জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারবে।

নমুনা স্বরূপ দু'একটি ছড়া উদ্ধৃত করা হ'লো : যথা—

ঠাকুর ঘরে ঠক্ ঠকিয়ে ঢুক্‌লো এখন কে ?
টাকী থেকে টগর ঠাকুর এলেন এখন যে।

অথবা—

কালিকটের কুমর পাড়ার কেষ্ট কামার যে—
কোন্নগরে কাকুর কাছে কখন এসেছে ?

অনুপ্রাসের বাহুল্যও ছেলেদের আনন্দ দেয় ; কাজেই ঐ ধরণের নানা শব্দ ছেলেদের উচ্চারণ করতে দিতে হবে। বার বার শব্দগুলি আবৃত্তি করতে করতে তারা বিশুদ্ধ উচ্চারণ করতে শিখবে : যেমন—

হাল্‌সি বাগানের হলধর হালদার হাড় কিপ্‌টে ;
হাটের মাঝে হঠাৎ পড়ে হাত গেল তার চিপ্‌টে।

অথবা—

শ্যামা, হাসি, শিবু, শশি মিলিমিশি,—
হাসি খুসী খেলে বসি দিবা নিশি।

অনেক সময় দেখা যায় যে, কতকগুলি ছেলে ঠিক মত 'ট' উচ্চারণ করতে পারে না। বিশেষ করে 'ট' অক্ষরটি শব্দের

প্রথমে, মাঝে বা শেষে থাকলে, সেগুলি উচ্চারণ করতে কোন কোন শিশুর বেশ অসুবিধা হয়। সে অসুবিধাটুকু দূর করবার জন্যে ঐ 'ট' অক্ষরটিকে কোন শব্দের প্রথমে, মাঝে ও শেষে জুড়ে দিয়ে এমন কতকগুলি ছড়া জাতীয় কবিতা লিখতে হবে, যেগুলি শিশুরা বার বার আবৃত্তি করে সে উচ্চারণ দোষ কাটিয়ে উঠতে পারবে। যেমন ধরা যাক—

ট্যাঁ-ট্যাঁ-ট্যাঁ টিয়া ডাকে টিনের খাঁচাতে ;
ঝোঁটন বাঁধা নোটন নাচে পুঁইয়ের মাচাতে।

কিংবা—

ঢুলিয়ে ঝুঁটি এলো ছুটি ঐ যে মোরগটি,—
ওরে দেখে তিতির ডাকে টি-টি-টি-টি।

এখানে প্রথম কবিতাটির প্রথম চরণে 'ট' অক্ষরটি শব্দের প্রথমে আছে, দ্বিতীয়টিতে আছে মধ্যে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ চরণে আছে শেষে।

অনুরূপ প্রণালীতে কি ভাবে 'প', 'হ', 'ল', 'ন', 'ও', 'উ', 'ক' প্রভৃতি স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলির উচ্চারণ দোষ যে কেমন করে সংশোধন করা যায়, তা দেখানোর জন্যে আবৃত্তির উপযোগী নিয়ে কতকগুলি ছড়া দেওয়া গেল ঃ—('ট', 'ঠ', 'ক' প্রভৃতি শব্দগুলির প্রয়োগ-প্রণালী ইতিপূর্বে দেখানো হ'য়েছে)।

'প' পরেশ, পারুল, পতিত, পাঁচু পশু পাখী পোষে—
স্বপন তপন পাপে তাপে মরছে নিজের দোষে।

'হ' 'হাবু', হারাণ, হাসু, হাসান, হরু, হরো, হাসি—
বেহালা বাজায় বাহা বাহা, বাজায় খাসা বাঁশী।

ইং Humpty Dumpty sat on wall
Humpty Dumpty had a great fall etc.

'ল' ললিত লবংগলতা,
পল্লবে উছলে ব্যথা,
ফুল্ল হলুদ ফুলে—
মলয়ানিলে দোলে !

'ন' নিমেষে নিভৃতে কোন্ শয়নে
নয়নে নেহারি যেন স্বপনে।

বা

নয় সে তো ভুল নয়—
নির্ণয় ! নিশ্চয় !

'ঙ' য়্যাঙ্ ব্যাঙ্ চ্যাঙ্
খাট পালঙের ঠ্যাঙ্।

অথবা

ঢঙ্ ঢঙ্ ঢঙ্
ঐ নাচে সঙ !

'ঐ' মৌমাছিদের মাতায় মলয় মৌবনে ;
ঢেউ লেগেছে মত্ত মেঘের যৌবনে।

'ও' হেঁ-ই জোরে মারো টান হেঁই ও ;
গুণ টেনে প্রাণপণে তরীখানি বাইও।

'উ' আতা গাছে তোতা পাখী, ডালিম গাছে মউ ;
কথা কও না কেন বউ ?

অথবা

সাগর বলে : থামলে কেন, চালাও জোরে ঢেউ ;
নৌকা বলে : ঢেউ তোমারে ভয় করি না কেউ।
কিংবা
শিয়াল দেখে কুকুর ডাকে—ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ।
বনের মাঝে বাঘের পিছে ঐ লেগেছে ফেউ।
'ফ' ফিকির করে ফটিক যখন এলো ফরিদপুরে—
তফাৎ থেকে ফড়িং মামা চিনলো মুসাফিরে।
'ক' কাকিনাড়ার কামিনী কুমার কর্মকার ;
কাশিপুরে করেছে কাঠের কারবার।

এ ছাড়া নানা প্রকার বাদানুবাদ বা প্রশ্নোত্তরের খেলায় ছেলেদের অংশ গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। কয়েকটি দলে ছেলেদের ভাগ করে, যে কোন একটা নাম দিতে হবে, যেমন— 'নেতাজী' দল 'বিবেকানন্দ' দল ইত্যাদি। প্রত্যেক দলের একজন করে নেতা থাকবে। যে কোন দলের একটি ছেলে বাইরে যাবে ; অপর কোন দলের নেতা সেই অবসরে নিজ দলের আট দশটি ছেলেকে বিচিত্র ধরণের কতকগুলি জিনিষ দেখিয়ে তার নাম মনে রাখতে বলবে। সেই দশ জন একটি গোলাকার বৃত্তের মধ্যে বসে বা দাঁড়িয়ে থাকবে। যে ছেলেটি বাইরে গিয়েছিল, সে ফিরে এসে সেই বৃত্তের ছেলেদের নানারূপ জিনিষ দেখিয়ে একে একে তাদের সকলকে জিজ্ঞাসা করবে যে, তাদের সে জিনিষটা দেখানো হয়েছে কিনা ! প্রশ্নের উত্তরে বৃত্তের ছেলেরা শুধু 'না' কিংবা 'হ্যাঁ' বলবে। এক্ষেত্রে প্রশ্নকর্তার অনুমান নির্ভুল, উচ্চারণ বিশুদ্ধ, এবং প্রশ্নের

বাক্যবিন্যাসগুলি সুন্দর হলে বেশী নম্বর পাবে। এইভাবে প্রথম দলের ছেলেদের দেখানো জিনিষগুলির নাম বা বৈশিষ্ট্যের কথা সঠিক ভাবে বলতে পারলে দ্বিতীয় দল যে নম্বর পাবে, তার চেয়ে প্রথম দলের নম্বর কম হ'লে, দ্বিতীয় দল জয়ী হবে। খেলাটা অবশ্য হবে পালাক্রমে। প্রথম দলের প্রশ্ন করা শেষ হ'লে, দ্বিতীয় দল সেই সুযোগ পাবে। এ ছাড়া প্রশ্নোত্তরের প্রতিযোগিতাও করা যেতে পারে। প্রতিযোগিতার পূর্বে প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতাদের ক্রমিক নামগুলি নিয়ে রাখতে হবে। অর্থাৎ কে কার পর প্রশ্ন করবে, কখন কে উত্তর দেবে, তা আগে থেকেই ঠিক করে রাখা ভাল। নইলে প্রশ্নোত্তরের সময় অসুবিধা হ'তে পারে। এই প্রতিযোগিতায় প্রশ্নোত্তর সমান পথে চলতে থাকবে। এক্ষেত্রে অবশ্য নেতারাই প্রথম প্রশ্ন করতে শুরু করবে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে প্রশ্নকর্তা যখন থামবে, অথবা উত্তরদাতা যখন আর উত্তর দিতে পারবে না, তখন খেলার শেষে নম্বর গণনা করা হবে। উচ্চারণ শুদ্ধি ও নির্ভুল প্রশ্নোত্তরের উপরই বেশী নম্বর দেওয়া হবে।

প্রথম খেলাটিতে এই ধরণের প্রশ্ন হতে পারে—রবিন (কোন একটি জিনিষ দেখিল) তুমি কি এই মাটির পুতুলটি দেখছো ?

রবিন ঃ না।

নীলু ঃ তুমি দেখছো ?

অথবা—

—হ্যাঁ।

—কি দেখছো ?

—পাখী।

—কি পাখী ?

টিয়া পাখী।

—টিয়া পাখী দেখতে কেমন ?

ইত্যাদি প্রশ্ন পালাক্রমে চলার পর উচ্চারণ ও ভাষাগত দোষ না থাকার দরুণ যে দল বেশী নম্বর পাবে, তারাই জিতবে।

এই প্রশ্নোত্তরের খেলা ছাড়াও আর একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে, কথা বলার সময় ছোটরা বড়দের অনুকরণ করে। কাজেই ছোটদের সংগে কথা বলার সময়, এ বিষয়ে একটু সচেতন থাকতে হবে, যাতে কথার মধ্যে কোন মুদ্রাদোষ, উচ্চারণ দোষ অথবা অন্য কোন ভুলচুক যেন না থাকে। তা ছাড়া কথার মধ্যে হঠাৎ উত্থান পতন থাকাটা ঠিক নয়। আবার অত্যন্ত জোরে কথা বলার অভ্যাসটাও বিশেষ ভাল নয় ; মিষ্টি মোলায়েম সুরে ছেলেদের কথা বলানোর অভ্যাস করানো উচিত। কবিতা আবৃত্তি করানোর মধ্যে দিয়ে সহজেই উক্ত দোষগুলি সংশোধন করানো যায়। তা' ছাড়া প্রশ্নোত্তরের সময় কোন্ কথায় কখন জোর দিতে হয়, তাও ছেলেদের শিক্ষা দিতে হবে। প্রশ্নোত্তরের সময় সাধারণতঃ quotation এর কথাগুলির উপর জোর দিতে হয়, যেমন :—

'কে বল্লে ?'—সে জিজ্ঞাসা করলে।

'আমি' ।—সে উত্তর করলে।

এখন কথা বলার দোষ ত্রুটি নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। কথা বলার প্রধান দোষ কি কি ?

(১) কথা বলার সময় যেখানে সেখানে জোর দেওয়া

(২) চড়া গলায় কথা বলা

(৩) বাক্যের শেষে সুর টেনে রাখা, ইত্যাদি।

কথা বলার প্রথম দোষত্রুটিগুলি শুধু দেখিয়ে দিলেই চলবে না, বাক্য-প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্বন্ধেও সঠিক জ্ঞানদান করতে হবে। বাক্যের বিভিন্ন স্থানে জোর দেওয়ার ফলে অর্থের কি অসংগতি ঘটে, তা' ছেলেদের বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে,—

কুকুরটা তোমার বিড়ালটাকে তাড়া করলো।

এই **বুঝি** কুকুরটা **বিড়াল**টাকে ধরলো।

যে কথাগুলিতে জোর দিতে হবে এখানে সেগুলোকে মোটা অক্ষরে দেখানো হ'য়েছে। এখন দেখা যাক, জোর দেওয়ার ফলে বাক্যগুলির অর্থ কি দাঁড়ায়।

প্রথম বাক্যে 'কুকুরটা' কথাটায় জোর দেওয়া হ'য়েছে। ফলে 'কুকুরটা' এখানে গল্পের প্রধান বক্তব্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কুকুরটা এক নিমেষে কোন একটা কাণ্ড ঘটাবে, সে বিষয়ে শিশুদের সচেতন করে তোলার জন্যে এখানে 'কুকুর' কথাটায় জোর দেওয়া হ'য়েছে। তা' ছাড়া কুকুর শব্দটা এখানে কর্তাকারক, বাক্যের প্রধান অংশ। কাজেই বাক্যের প্রথম অংশে জোর দেওয়া হ'য়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে 'বুঝি' এবং 'বিড়াল' কথাটিতে জোর দেওয়া হয়েছে। ওখানে আসন্ন দুর্ঘটনার গুরুত্ব সম্বন্ধে শিশুদের সতর্ক করে দেওয়ার জন্যে বুঝি শব্দের উপর জোর দেওয়া হ'য়েছে, আর যার ভাগ্য বিপর্যয় ঘট্‌ছে, সেই বিড়ালটার বিষয়ে শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ

করানোর জন্য ঐ শব্দটায় জোর দেওয়া হয়েছে। এইভাবে নানা বাক্য রচনা ক'রে বাক্য বিন্যাস সম্বন্ধে শিশুদের মনে ধারণা জন্মে দিতে হবে।

এ ছাড়া নির্ভুল কথা বলার সু-অভ্যাস গঠনের জন্যে আর একটি সাধারণ খেলার আমদানী করা যেতে পারে। খেলাটি আর কিছুই নয়, দৌড়ে আসার পর ছেলেদের বলতে হবে নিজের পরিচয় দাও। অমনি সে বলবে ঃ

—আমার নাম চারু সেন,
থাকি ৩ নং স্কট লেন।

—ইত্যাদি ধরণের পরিচিতির কথা।

অথবা অন্য যে কোন কথা, যেমন—

নীল রঙের বল চাই ;
খেলবে আমার ছোট ভাই।

কথন-ক্ষমতা বিকাশের ব্যাপারে নাট্যাভিনয় বা আবৃত্তির অবদান বড় কম নয়। অভিনয়ের মধ্যে নিঃসংকোচে প্রকাশ ভংগী বাড়ে, ভাবাবেগ মূর্ত হয়। কণ্ঠস্বরের উত্থানপতন সম্বন্ধেও একটা নির্ভুল ধারণা জন্মে। তা'ছাড়া উচ্চারণ শুদ্ধি ঘটে।

এ ছাড়া মুখে মুখে গল্প রচনা করা ও extempore কিছু বলানোর অভ্যাস করানোর মারফতেও শিশুদের কথন-ক্ষমতা বাড়ানো চলে। কথন শিক্ষার প্রধান প্রেরণাই হ'চ্ছে বহিঃসংকেত অথবা শ্রেণী পরিবেশের প্রভাব। পরিবেশই শিশুদের কথা বলায়। তাই আমরা দেখতে পাই যে, The atmosphere is such that the child is encouraged to talk and increase his vocabulary. কাজেই কথন-শিক্ষার ব্যাপারে পরিবেশের কথা ভুললে চলবে না।

———

॥ গণিত শিক্ষণ পদ্ধতি ॥

Arithmetic is the easiest, and consequently the first sort of abstract reasoning which the mind commonly bears, or accustoms itself to; and is of so general use in all parts of life and business, that scarce anything can be done without it.

Mathematical study provides the reasoning powers with suitable exercise, and thus strengthens them.

No sum should be passed until it is correct.

জীবনের খতিয়ানে চলেছে প্রতি মুহূর্তের হিসাব আর নিকাশ। হিসাবের জগৎ আমাদের চারিদিকে—সামনে পিছনে, ডাইনে বাঁয়ে। হাট বাজার, অফিস আদালত, দপ্তরীখানা, কোথায় হিসাব নিকাশ নেই?

হিসাব না জানলে লাভ লোকসানের জগতে পদে পদে ঠকতে হয়।

অঙ্ক শিখতে ছোটদের বেশ কিছু সময় লাগে। সংখ্যা গণনার ব্যাপারটা শিশুদের কাছে বিরক্তকর। তার কারণও আছে। সংখ্যা-পরিচিতির আগেই সংখ্যা গণনার অনুশীলন আরম্ভ হয়ে যায়। বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। গতানুগতিক ভাবে চলে মুখস্থের পর্ব। সেটা একেবারে কৃত্রিম ব্যাপার। যন্ত্রচালিত পদ্ধতি বিশেষ। তাতে বৈচিত্র্যও নেই, আনন্দও নেই। এটাকে মনস্তাত্ত্বিকরা বলেছেন, অনুশীলনের অত্যাচার।

প্রচলিত পদ্ধতি

পূর্বে আমাদের দেশে সংখ্যার ধারণা দেওয়া হতো ছড়ার মাধ্যমে। সেটা ঠিক বিজ্ঞান সম্মত না হ'লেও, সে ছড়ার ছন্দটা শিশুদের মনে আনন্দ সঞ্চার করতো। ফলে সেই সমিল শব্দের ধ্বনিটা শিশুদের কান থেকে মনে গিয়ে পৌছুতো। এমনি করে তাদের স্মৃতিতে জড়িয়ে যেতো। নিছক সংখ্যা গণনা শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে এ পদ্ধতিটা অনেক ভালো। আজও এ পদ্ধতিতে এ দেশের ছেলে মেয়েদের প্রথম সংখ্যার ধারণা দেওয়া হ'চ্ছে। এটাকে মন্দের ভালো পদ্ধতি বলা চলে। এ পদ্ধতির মধ্যে আরও দুটো দিক্ আছে। প্রথমতঃ আছে আবৃত্তির আনন্দ, দ্বিতীয়তঃ আছে একাধিক বস্তু প্রকৃতির কথা। ছোট বয়সে ছেলেরা সেই সব কথার অর্থ ঠিক মত বুঝতে না পারলেও, অনেক গুলো কথার

সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটে। ছড়াটা এখানে উদ্ধৃত করা গেল :—

একে চন্দ্র,
দুয়ে পক্ষ,
তিনে নেত্র,
চারে বেদ,
পাঁচে পঞ্চবাণ,
ছ'য়ে ঋতু,
সাতে সাত সমুদ্র,
আটে অষ্ট বসু,
নয়ে নব গ্রহ,
দশে দিক্ ॥

অথবা—

এক দুই—
জমি রুই।
তিন চার,
বীজ ছাড় ;
পাঁচ ছয়,
আর নয় !
সাত আট,
এই মাঠ,
নয় দশ,
জমি চষ্।

এমনিতর একাধিক পদ্ধতি আছে। সে সম্পর্কে আলোচনা করার আগে, আরও কিছু জানা দরকার। সেগুলি হ'চ্ছে অঙ্ক শাস্ত্রের বিভিন্ন দিকের কথা। প্রথম আলোচ্য বিষয় হ'চ্ছে অঙ্ক শেখার ব্যবহারিক মূল্য কি? কেনই বা গণিত শিখতে হবে?

অঙ্ক শিক্ষার প্রয়োজন

তার উত্তরে শিক্ষাবিদ্‌রা বলেছেন যে, হিসাবের অঙ্কে সভ্য জগৎ চলে। সৌর-জগতের চারদিকেও কি হিসাবের কড়াকড়ি। তার এক চুল এদিক ওদিক হবার জো নেই। এহেন লেন-দেনের জগতে হিসাব-নিকাশকে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। জীবনের খতিয়ানে চলেছে প্রতি দিনের জমা আর খরচ। প্রতি মুহূর্তে প্রত্যেকটি লোককেই হিসাব করে চলতে হ'চ্ছে। প্রতিদিন হাট-বাজারে কেনা-কাটার সময় যোগ-বিয়োগের অঙ্ক হরদম কষতে হ'চ্ছে। সেই হিসাবে অপটু হ'লে, পদে পদে ঠকতে হবে। এই জন্যে অঙ্ক শেখার বিশেষ প্রয়োজন।

(ক) এটাই গণিত শিক্ষার ব্যবহারিক মূল্য।

(খ) এ ছাড়া গণিত শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন ও মূল্য আছে। তাকে গাণিতিক প্রয়োজন বলা চলে। গাণিতিক হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে মগজের যে বিকাশ ঘটে, অন্য কোন পাঠ্য বিষয় অধ্যয়নের দ্বারা তা সম্ভবপর হয় না। অঙ্ক কষার সুবিন্যস্ত পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা যে নিয়ম-তান্ত্রিক, সঠিক এবং নির্ভুল পন্থার নির্দেশ পাই, তার দ্বারা আমাদের চিন্তাধারা সুবিন্যস্ত হয়, মননশীলতার সঠিক, নির্ভুল ধারাটি আমাদের

আয়ত্তে আসে। গণিত বিজ্ঞানের অধ্যাপক লর্ড এ প্রসঙ্গে একটি চমৎকার কথার অবতারণা করেছেন। তিনি বলেছেন পেশাগত দৈনন্দিন কাজের সময় প্রত্যেককেই কিছু-না কিছু যোগ বিয়োগ করতে হয়। এর ফলে মানসিক শৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়। এই অনুশীলনের মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তি সূক্ষ্ম এবং মননশীলতা সুদৃঢ় হয়। লর্ডের এই অভিমতকে সমর্থন করে বেকন বলেছেন যে, গণিতশাস্ত্র হ'চ্ছে সুপণ্ডিত, তার ব্যবহারিক মূল্যের জন্য কিন্তু একথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে তার তার্কিক পদ্ধতি প্রয়োগের নির্ভুলতার জন্য। এই শিক্ষা পদ্ধতি অনুশীলনের জন্য মনকে যে শিক্ষানবিসীর স্তর অতিক্রম করতে হয়, তার দ্বারা মনের বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি বাড়ে।

কেমন করে শিশুর মনে সংখ্যার ধারণা আসে? শিশুর প্রথম জ্ঞান বস্তুগ্রাহ্য। সে ধারণা জন্মায় ইন্দ্রিয় মারফতে। বিমূর্ত (abstract) কোন বস্তুর কথা শিশুরা যেন ভাবতেই পারে না। যার কোন আকৃতি নেই, ছবি বা রঙের কোন জৌলুস নেই, সেই বিমূর্ত বস্তুর ধারণা যেন কিছুতেই শিশুদের মনে দাগ কাটতে পারে না। গণিতের সংখ্যাগুলো আঁকা-বাঁকা বিচিত্র রেখার সমষ্টি মাত্র, তার আকার আছে, অথচ কোন মূর্তি নেই। তাই সেই বিদঘুটে বিমূর্ত সংখ্যাগুলো শিশুদের সামনে এলোমেলো হয়ে দেখা দেয়। সংখ্যার ধারণাগুলো মন থেকে মগজে গিয়ে পৌঁছুতে সময় লাগে।

তথাপি প্রসঙ্গক্রমে শিশুদের মনে সংখ্যা ও পরিমাণের

একটা ধারণা জন্মায়। সেটা অবশ্য সঠিক অথবা ধারাবাহিক নয়। তাই সংখ্যা গণনার সময় ৬এর পর পাঁচ বলাতে যে কি অসঙ্গতি ঘটলো, তা শিশুরা বুঝতে পারে না। এইজন্য শিশুদের প্রথম সংখ্যার ধারণা ভাসা ভাসা, তা সুস্পষ্ট নয়। মা-বাবা ভাই-বোনদের মুখে তারা রোজ কত সংখ্যার হিসাব, মাপ-জকের কথা শোনে। তখন বস্তুর পরিমাপ, সংখ্যার পরিমাণ শিশুদের মনে কৌতূহল জাগায়। 'এত বড়', 'অনেকক্ষণ', 'তাড়াতাড়ি করো', 'দেরী হ'লো কেন', 'অনেক ফল এনেছি', আজ মাসের '৫ তারিখ' ইত্যাদি কথাগুলো শিশু-কল্পনায় আলোড়ন তোলে। সে মনে মনে কথাগুলোর অর্থ বুঝতে চায়, অথচ সব গোলমাল হয়ে যায়। সেই অপরিণত ধারণা নিয়ে সে এক দুই করে গণনা করার অভ্যাস করে। এই সময় গুণতে বললে, সে আরম্ভ করে ১, ২, ৫, ৪ ইত্যাদি। এই ধরণের এলোমেলো ভাবে সে সংখ্যাগুলি আবৃত্তি করে। কার আগে কোনটার পরে কি সংখ্যা, সে কথা শিশুরা ভাবে না। তাই কোন কথাই তার মুখে আটকায় না।

শিশুর অঙ্ক-ভীতি ঃ অঙ্কের বিষয়টি একটু খটমটে। শিশুর অপরিণত মগজে অঙ্কের ধারণাটা যেন কিছুতেই ঢুকতে চায় না। যে সংখ্যার এলোমেলো ধারণা নিয়ে শিশুরা বিদ্যালয়ে আসে, শিশুদের অঙ্ক শেখানোর সময় সেই কথাটাই সর্বাগ্রে চিন্তা করতে হবে। যাতে অঙ্কের প্রতি শিশুর এতটুকু বিতরাগ না জন্মায়, সে দিকে বিশেষ নজর দেওয়া উচিত। প্রথমে জানা উচিত অঙ্ক সম্বন্ধে শিশুদের পূর্বজ্ঞান কতটুকু

আছে। সেইজন্য সংখ্যা-গণনা-সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে শিক্ষকদের নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে অবহিত হ'তে হবে :— (১) সংখ্যা সম্বন্ধে শিশুদের কতটুকু ধারণা আছে (২) যদি কোন ধারণা থাকে, তবে জানতে হবে কেমন ভাবে এবং কিসের মারফতে শিশুরা সেই জ্ঞান লাভ করেছে। চেনা পরিবেশ থেকে শিশুরা যে জ্ঞান আহরণ করে, ব্যবহারিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সেই অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞানের যথেষ্ট মূল্য আছে। এখানে বয়স্ক মনের বিচার বিবেচনা দিয়ে শিশুদের যাচাই করলে, শিশু মনস্তত্ত্বকে অস্বীকার করা হবে। শিশুদের অকৃতকার্যতায় ধৈর্য হারালে চলবে না। শিক্ষকদের জানতে হবে কেন ছেলেরা অঙ্ক করতে পারছে না, বোঝানোর মধ্যে কোথায় ত্রুটি আছে, কি জন্য বিষয়টি বোধগম্য হ'চ্ছে না। সব সময় শিশুদের উৎসাহ দিতে হবে। বার বার সরস প্রণালীর অবতারণা করে বিষয়টি শিশুদের কাছে উপস্থাপিত করতে হবে, যাতে অঙ্কের প্রতি শিশুদের মনে অনুরাগ জন্মায় ; তারা যেন উপলব্ধি করে বিষয়টি কি সহজ এবং হিসাব-নিকাশের মধ্যে কত মজার ব্যাপার আছে। অঙ্ক কষার মধ্যে যে আবিষ্কারের আনন্দ আছে, সমস্যার মীমাংসা আছে, শিশুরা যাতে নিজস্ব উপলব্ধির মাধ্যমে প্রসঙ্গক্রমে সেগুলি আবিষ্কার করতে পারে, বার বার শিশুদের সেই সুযোগ দিতে হবে। এর অন্যথা ঘটলে, শিশুদের আত্ম-প্রত্যয় নষ্ট হবে ; অঙ্কের প্রতি তাদের একটা বিরূপ মনোভাব জাগবে, তার ফলেই শিশুদের মনে অঙ্ক-ভীতি জন্মাতে পারে।

এ ছাড়া আরও অনেকগুলি কারণ আছে, যার জন্য শিশুরা অঙ্কে পিছিয়ে পড়ে। কারণগুলি নিম্নরূপ ঃ—(ক) অঙ্ক কষানোর দোষ, (খ) শ্রেণী পরিচালনা ও শিক্ষা প্রণালীর দোষ, (গ) বুদ্ধির তারতম্য অনুযায়ী শিশুদের ভাগ করে না নেওয়ার দরুণ। এখন দেখা যাক্ কেন এবং কি ভাবে শিশুদের মনে অঙ্ক-ভীতি আসে।

(ক) অঙ্ক কষার দোষ ঃ অনেক শিক্ষক আছেন, যাঁরা নিজেরাই অঙ্ক কষতে ভালোবাসেন। শ্রেণীতে এসে ঝড়ের মত অঙ্কের পর অঙ্ক কষিয়ে যান। কে কতটুকু বুঝলো, কারা কতটুকু শিখলো, সে দিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ থাকে না? কোন রকমে বৎসরের পাঠ্যসূচী শেষ করতে পারাটাই ভালো শিক্ষকের লক্ষণ। এটা কিন্তু অঙ্ক শেখানোর মস্ত বড় দোষ। ছোট বয়সে যখন অনুধাবনের শক্তি কম, তখন অনবরত তাড়া-হুড়ার মধ্যে পড়ে শিশুরা হাবুডুবু খাবে, কিছুই শিখতে পারবে না। শিশু-শ্রেণীতে এই ভাবে কখনই অঙ্ক কষানো উচিত নয়।

(খ) শ্রেণী পরিচালনা ও শিক্ষা প্রণালীর দোষ ঃ অনেক সময় শ্রেণী-পরিচালনা ও শিক্ষা-প্রণালীর দোষেও শিশুরা অঙ্কে পিছিয়ে পড়ে। অনেক শিক্ষক আছেন, যারা শ্রেণীতে এসে একটানা অঙ্ক কষিয়ে যান, ছেলেরা কতটুকু বুঝলো বা না বুঝলো, সেদিকে কোন নজরই দেন না। ফলে সেই বৈচিত্র্যহীন একঘেয়েমির ক্লান্তিতে অঙ্কের প্রতি শিশু-মনে বিতৃষ্ণা জন্মে। অঙ্কের শ্রেণীতে তারা যেন হাঁপিয়ে উঠে। আর এক শ্রেণীর

শিক্ষক আছেন, যারা ভালো ছেলেদের সামনে এবং খারাপ ছেলেদের পিছনের বেঞ্চে বসানো ব্যবস্থা করেন। তার ফলে ঐ দুই শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে দ্বৈত-প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ভালো ছাত্ররা যখন আত্মম্ভরীতায় মত্ত হয়ে উঠে, তখন অপেক্ষাকৃত খারাপ ছাত্ররা হীনমন্যতায় কষ্ট পায়। এই দ্বৈত মনোভাবই শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর।

(গ) **বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে ছাত্রদের শ্রেণী ভাগ ঃ** সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণীতে দুই ধরণের ছাত্র দেখা যায়। এক শ্রেণীর ছাত্র আছে, যারা বেশ বুদ্ধিমান, লেখাপড়ায় বিশেষ অগ্রসর ; অন্য এক শ্রেণীর ছাত্র আছে, যাদের জ্ঞানের প্রসার লাভ হয় অত্যন্ত ধীর গতিতে। কাজেই পিছিয়ে পড়া এবং বুদ্ধিমান ছাত্রদের একই শ্রেণীতে এক পদ্ধতিতে অঙ্ক শেখানো উচিত নয়। তাতে উভয় শ্রেণীর ছাত্রদেরই ক্ষতি হতে পারে। বিভিন্ন ধরণের ছাত্রদের জন্য ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বিত হওয়া উচিত।

(ঘ) **অঙ্কের ক্রমিক স্তর (gradation) ঃ** অঙ্কের বিষয়টি জটিল হলেও, খুব বিজ্ঞানসম্মত। পদ্ধতিটি যেমন ধারাবাহিক, তেমনি নিখুঁত। কাজেই এলোমেলো ভাবে ছোটদের অঙ্ক শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। অঙ্কের ধাপগুলি অনেকটা সিঁড়ির মত। তাই অঙ্ক শিক্ষা দেওয়ার সময় ধাপগুলি ঠিকমত সাজিয়ে নিতে হয়। নূতন ধাপের প্রথম দিকে খুব ছোট ছোট সহজ অঙ্ক দেওয়া উচিত। প্রথম দিকের অঙ্কগুলি বেশ আয়ত্ত হলে, তবেই অপেক্ষাকৃত কঠিন অঙ্ক দিতে

হবে। এই ভাবে অঙ্ক শেখালে বিষয়টি শিশুদের কাছে চিত্তাকর্ষক এবং হৃদয়গ্রাহী হবে।

আকার ওজন এবং পরিমাপের ধারণা ঃ

বিদ্যালয়ে আসার আগেই বস্তুর 'আকার', 'ওজন' এবং 'পরিমাণের' কিছু কিছু ধারণা শিশুর থাকে। পরিবেশের অভিজ্ঞতা থেকেই শিশুর সে জ্ঞান জন্মায়। 'বড়' বা 'ছোটর' সম্বন্ধে শিশুর সঠিক জ্ঞান না থাকলেও, অল্প বয়সেই ঐ দুটি শব্দের সঙ্গে শিশুর পরিচয় ঘটে। প্রসঙ্গক্রমে কথাগুলি শুনতে শুনতে ও-সম্বন্ধে শিশুদের মনে কৌতূহল জাগে। শিশুদের এই ঔৎসুক্যগুলিকে কাজে লাগানোর জন্য নানা উপকরণের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। বস্তুর মাধ্যমে শিশুদের মনে ঐ সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান দান করতে পারলে খুবই ভালো হয়। কেমন ভাবে কোন্ জিনিসকে কি কাজে লাগানো যেতে পারে, শিক্ষকরা নিজ নিজ উপস্থিত বুদ্ধি এবং উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা তা ঠিক করে নেবেন।

এখন ভেবে দেখা যাক, কি করে শিশুদের 'বড়-ছোট', 'ভারী-হাল্কা' 'গোল-চৌকো' ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেওয়া যায়।

(১) বড়-ছোট ঃ শিশুদের মনে বস্তু সম্বন্ধে সঠিক ধারণা যাতে বদ্ধমূল হয়, সেজন্য নানা উপকরণ যোগাড় করতে হবে। বিভিন্ন আকারের কতকগুলি বাক্স এবং কৌটা সংগ্রহ করে, সেগুলিকে দু' ভাগে ভাগ করতে হবে। একদিকে থাকবে বড়

বাক্সগুলি, অন্য দিকে রাখতে হবে ছোট বাক্স বা কৌটাগুলি। তারপর শিক্ষকের নির্দেশমত শিশুরা আকার অনুসারে সেগুলি সাজিয়ে রাখবে।

এ ছাড়া বিভিন্ন আকারের ঘর, গাছ, টেবিল, বেঞ্চ ইত্যাদির সাহায্যেও শিশুদের মনে বড়-ছোটর ধারণা দেওয়া যেতে পারে।

(২) **ভারী-হাল্কা** ঃ অপেক্ষাকৃত তুলনামূলক ধারণা থেকে শিশুদের মনে ভারী-হাল্কার জ্ঞান জন্মায়। সেজন্য কিছু কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার দরকার হয়। একই রকমের দেশলাইয়ের বাক্সে বিভিন্ন পরিমাণের মাটি বা বালি পূরে ছেলেদের হাতে দিলেই, তারা বুঝতে পারবে কোনটির চেয়ে কোনটি বেশী ভারী বা হাল্কা। দাঁড়িপাল্লার সাহায্যেও ভালো-ভাবে ঐ জ্ঞান দেওয়া যেতে পারে।

(৩) **গোল-চৌকো** ঃ আকারগত বৈসাদৃশ্যটাই শিশুদের চোখে সহজেই ধরা পড়ে। এক্ষেত্রে মন্তেসরি প্রবর্তিত **ইনসেটস্‌**গুলি খুবই কার্যকরী হবে। এই ইন্‌সেটস বাক্সে গোল-চৌকো, তে-কণা বিভিন্ন ধরণের গর্ত থাকে। সেই অনুরূপ গোল-চৌকো তে-কণা প্রভৃতি আকারের কাঠের টুকরো ছেলেদের দেওয়া হয়। ছেলেরা তখন যে গর্তে যে কাঠের টুকরো লাগে, তা লাগানোর চেষ্টা করে *। এইভাবে অতি সহজেই শিশুদের মনে গোল-চৌকোর ধারণা জন্মায়। এ ছাড়া বল, পোষ্টকার্ড প্রভৃতির সাহায্যেও ঐ ধারণা দেওয়া যায়।

* লিখন শিক্ষার ৫-এর 'খ' চিত্র দ্রষ্টব্য।

(৪) **কিছু, অনেক ও কয়েকটা ঃ** এ জ্ঞানও আসে তুলনামূলক জ্ঞান থেকে। এক্ষেত্রে কিছুটা বিচার বিবেচনার দরকার হয়। এজন্য একাধিক উপকরণের প্রয়োজন। কাঁই বীচি, রঙিন কাঠি, ছোট পাথরের টুকরোর সাহায্যেও এ জ্ঞান দেওয়া যায়। শিক্ষক মহাশয় রঙিন কাঠি বা কাঁইবীচি সংগ্রহ করে তিনটি ভাগে ভাগ করবেন। প্রথম ভাগে থাকবে গোটা কয়েক কাঁইবীচি, দ্বিতীয় ভাগে থাকবে আরও কিছু বেশী, তৃতীয় ভাগে থাকবে অনেক। এগুলি নাড়াচাড়া করে শিশুদের মনে 'কম বেশী' সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মাবে।

(৫) **বেশী লম্বা বা একটু ছোট ঃ** এই পর্যায় থেকে শিশুর মনে পরিমাপের ধারণা আসবে। বিভিন্ন মাপের কাঠি, দড়ি, ফিতে প্রভৃতি উপকরণগুলিকে এক্ষেত্রে কাজে লাগানো যেতে পারে। টেপের সাহায্যে ঘরের দৈর্ঘ ও প্রস্থ পরিমাপ করেও ও-সম্বন্ধে সঠিক ধারণা দেওয়া সম্ভব।

১ থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা শিক্ষা ঃ

ক্রমিক সংখ্যা-গণনা শিক্ষা দেওয়ার আগেই শিশুরা কিছু কিছু গণনা করতে পারে। সে গণনার ধারণা অবশ্য নির্ভুল, বা ক্রমিক নয়। সেই জন্য বস্তু গ্রাহ্য কাজ বা খেলার সাহায্যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মারফতে সংখ্যার সঠিক ধারণা দেওয়া উচিত। এই কারণে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত সমস্ত সংখ্যাগুলি একেবারে না শিখিয়ে দুটি দুটি করে শেখানো ভালো হয়। সংখ্যার ধারণা একটু স্পষ্ট হ'লে, বোর্ডে বড় বড় করে লিখে

দিতে হবে। তারপর ছেলেদের দিয়ে সংখ্যাগুলো বলাতে হবে। বিভিন্ন রঙের চক দিয়ে নূতন শেখা সংখ্যাগুলি লিখে দিতে হবে।

এই ভাবে ক্রমে ক্রমে ১—থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলি যখন শিশুদের একটু সরগড় হবে, তখন নিম্নলিখিত খেলার আমদানী করা যেতে পারে।

১। পুতুলের সাহায্যে সংখ্যা গণনা ঃ

এই খেলার জন্য ৫০টি পুতুলের প্রয়োজন। আর দরকার ৫০টি চৌকো কাঠের টুকরো। পুতুল ও কাঠের ব্লকের গায়ে ১, ২ করে ক্রমিক সংখ্যা লেখা থাকবে। শ্রেণীর ছাত্রদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করে নিতে হবে। তার পর ঘরের মধ্যে ফুট দশেক দূরে একটি সারিতে ১০টি পুতুলকে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে। পুতুলগুলি ঠিক ১, ২, ৪, ৩, ৭ ইত্যাদি ভাবে সোজা দাঁড় করানো থাকবে। ঘরের মাঝামাঝি সারিতে পুতুল থাকবে, পুতুলের দুই দিকে ১০ ফুট দূরে ১০ জন করে ২০ জন ছাত্র থাকবে। খেলা সুরু বলার সঙ্গে প্রথম দলের এক নম্বর ছেলেটি পুতুলের দিকে রবারের বল ছুড়ে দেবে। বল লেগে যদি ১ নম্বরের পুতুলটি পড়ে যায়, তখন শিক্ষক মহাশয় ছেলেদের জিজ্ঞাসা করবেন ক' নম্বরের পুতুল পড়ে গেছে? তখন ছেলেরা সমস্বরে বলবে 'এক নম্বরের পুতুল।' শিক্ষক মহাশয় আবার প্রশ্ন করবেন 'কোন্ বেদীর উপর দাঁড় করাতে হবে? ছেলেরা আবার জবাব দেবে ১ নম্বর বেদীর উপর। তখন প্রথম দলের প্রথম ছেলেটি (অর্থাৎ যার

বল লেগে পুতুলটি পড়ে গিয়েছিল) এক নম্বর বেদীর উপর এক সংখ্যা আঁটা পুতুলটিকে দাঁড় করিয়ে দেবে। এই ভাবে পালাক্রমে দুই দলের ছেলেরাই পুতুল ফেলা এবং বেদীর উপর দাঁড় করানোর খেলা চলবে। যে দল নির্ভুল ভাবে পর পর সমস্ত ক্রমিক সংখ্যার পুতুলগুলি ঐ ভাবে বেদীর উপর সাজাতে পারবে, তারাই খেলায় জয়লাভ করবে। এই খেলার মাধ্যমে শিশুদের মনে ক্রমিক সংখ্যার ধারণা বদ্ধমূল হবে।

২। মাছ ধরার খেলা ঃ

মাছ ধরার উপলক্ষকে কেন্দ্র করেও সংখ্যা গণনার চমকপ্রদ খেলা হতে পারে। একটি বড় জলের টবে থাকবে গোটা ৫০ সোলার মাছ। প্রত্যেকটি মাছের গায়ে ১, ২, ৩, ৪ করে ৫০ পর্যন্ত সংখ্যা লেখা থাকবে। ভাসমান মাছের গায়ে উপর দিকে একটি ছোট লোহার পাত বসানো থাকবে। ছোট ছোট ছিপের সঙ্গে আঁটা থাকবে একটি চুম্বক খণ্ড। ছেলেরা চম্বুকের বর্শীর সাহায্যে পালাক্রমে এক একটি সোলার মাছ গেঁথে ডাঙায় তুলবে। কোন্ কোন্ সংখ্যার মাছ ধরা পড়েছে, শিক্ষক মহাশয় বোর্ডে সেই সংখ্যাগুলি লেখে দেবেন। তার পর শিক্ষক মহাশয় ছেলেদের ক্রমিক সারিতে দাঁড় করিয়ে দেবেন। ১ নম্বর মাছ ধরেছে যে সে দাঁড়াবে প্রথমে, তারপর ২, ৩, ৪ করে ক্রমে ক্রমে ৫০ জন ছাত্রদের দাঁড় করিয়ে দিতে হবে। দাঁড়ানোর পালা শেষ হ'লে শিক্ষক পর পর ছাত্রদের নিজ নিজ মাছের সংখ্যা বলতে বলবেন। এই ভাবে ছাত্ররা পালাক্রমে ৫০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করবে। তার পর ৫০টি

সোলার মাছকে এক সারিতে সাজিয়ে দিয়ে পালাক্রমে ছেলেদের ৫০ পর্যন্ত গুণতে দিতে হবে। এই ভাবে প্রত্যেকটি ছাত্র ১, ২, ৩, ৪ করে ৫০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করবে।

৩। ঘুরানো কেলেণ্ডার :

ঘুরানো ক্যালেণ্ডারের সাহায্যে দু'দিক থেকে সংখ্যা গণনা শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। একজন ছাত্র ক্যালেণ্ডারটি ঘুরাতে থাকবে, যখন সংখ্যাটি ক্যালেণ্ডারে দেখা যাবে, ছাত্ররা তখন উচ্চস্বরে সেই সংখ্যা গণনা করবে। এই ভাবে ৫০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা শেষ হ'লো, উল্টো দিকে ক্যালেণ্ডারটি ঘুরাতে হবে। তখন ছাত্ররা ৫০, ৪৯, ৪৮ এই সংখ্যা গণনা করে শেষ সংখ্যা অর্থাৎ একে ফিরে আসবে। এই ভাবে সংখ্যা গণনা শিক্ষা করলে, ক্রমিক সংখ্যার নির্ভুল ধারণা ছেলেদের মনে বদ্ধমূল হবে।

৪। **চৌকো কাঠের সাহায্যে সংখ্যা গণনা :** উপকরণের সাহায্যে সংখ্যা গণনার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুদের ব্যবহারিক জ্ঞানকে কাজে লাগানো। এর জন্য একাধিক উপকরণের প্রয়োজন। প্রথমে ১০টি চৌকা কাঠ যোগাড় করতে হবে। কাঠগুলিকে সমান একশ'টি খণ্ডে বিভক্ত করতে হবে। ১, ২, ৩, ৪ করে কাঠগুলিতে বড় বড় করে সমস্ত সংখ্যাগুলি লিখে দিতে হবে। সেই সংখ্যা লেখা কাঠগুলি একটু তফাতে এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে রাখতে হবে। তার পর ছেলেদের এক সারিতে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে। শিক্ষক মহাশয় তখন যে ছেলেটিকে যে সংখ্যার চৌকো কাঠের

টুকরো আনতে বলবেন, সে তখনই দৌড়ে গিয়ে সেই সংখ্যা লেখা কাঠের টুকরোটি এনে শিক্ষক মহাশয়ের হাতে দেবে।

৫। **সংখ্যা গণনায় কার্ডবোর্ডের ব্যবহার ঃ** এই সংখ্যা গণনার মধ্যে দু'টি জিনিষ থাকবে। এক সংখ্যা লেখা কার্ড, দ্বিতীয় সংখ্যার আনুপাতিক সংকেত চিহ্ন আঁকা বা রঙিন ফুটকি দেওয়া কার্ড। প্রত্যেকটি কার্ডের আকার ও আয়তন একই হবে। সংখ্যা লেখা কার্ডগুলি দূরে পৃথক করে রাখতে হবে। ফুটকি দেওয়া কার্ডগুলি থাকবে শিক্ষক মহাশয়ের হাতে। শিক্ষক যখন যাকে ডেকে যে সংখ্যার ফুটকি দেওয়া কার্ড দেবেন, তাকে সেই সংখ্যার কার্ডটি এনে শিক্ষক মহাশয়ের হাতে দিতে হবে। এতে দ্বৈত উপায়ে শিশুদের মনে সংখ্যার ধারণা আসবে।

৬। **লুকানো সংখ্যার খেলা ঃ** এই গণনা পদ্ধতিতে সংখ্যা এবং সংখ্যার সাংকেতিক চিহ্নগুলি একই সঙ্গে দেওয়া থাকে। সংকেত চিহ্নগুলি দেখে বলতে হয়, কত সংখ্যা লেখা আছে। একটি ৮″ লম্বা ও ৪″ চওড়া মোটা কাগজকে দু' ভাঁজ করে তার উপরে যটি ফুটকি দেওয়া হবে, ভিতরেও থাকবে সেই সংখ্যাটি লেখা। ভাঁজ করা কাগজটি ছেলেদের হাতে দিতে হবে, ছেলেরা সেই ফুটকি দেখে বলবে ভিতরে কত সংখ্যা লেখা আছে। ঠিক সংখ্যাটি বলতে না পারলে, কাগজের ভাঁজ খুলে দেখে বলবে ভিতরের সংখ্যাটি কত। উল্টো ভাবেও এই খেলাটি হতে পারে। যেমন কাগজের

উপরে ফুটকিগুলি দেওয়া থাকবে, ভিতরে ক'টি ফুটকি আছে, তা ছেলেদের বলতে হবে।

৭। মজার কার্ডঃ এই খেলার সময় সংখ্যা ও তার চিহ্নগুলিকে পাশাপাশি রেখে মেলাতে হয়। এর জন্য কতকগুলি কার্ডবোর্ডকে গোল করে কেটে নিতে হয়। তার পর যেমন তেমন করে সেই কার্ডবোর্ডগুলি দ্বিখণ্ডিত করতে হবে। গোল কার্ডবোর্ডগুলিকে এমন ভাবে কাটা উচিত যাতে সেগুলি জোড়া দিলে যেন মিলে যায়। এই দ্বিধা বিভক্ত কার্ডগুলির একটিতে হবে সংখ্যা লেখা, অন্যটিতে থাকবে ফুটকি দেওয়া। এইগুলি শিশুদের হাতে দিয়ে বলতে হবে যে ফুটকি ও সংখ্যার সঙ্গে মিল করে জোড়া লাগাও। ছেলেরা তখন আপন মনে সংখ্যা ও ফুটকির মিল করতে সচেষ্ট হবে।

এ ছাড়া বইয়ের পাতা, জামার বোতাম, কাঁইবীচি, নিজের হাতের আঙুল, শ্রেণীর ছেলে মেয়ে ইত্যাদি অনেক কিছুকেই এই কাজে লাগানো যেতে পারে।

দশের উর্ধ্ব সংখ্যার ধারণা কি ভাবে দিতে হবে ?

দশের উর্ধ্ব সংখ্যা শেখানো আগে পরীক্ষা করে দেখতে হবে, ১০ পর্যন্ত সংখ্যার সঠিক ধারণা শিশুদের হয়েছে কিনা। দশের পর থেকে দশ, দশ করে সংখ্যা গণনা শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

শিক্ষোপকরণের সাহায্যে (যেমন কাঁইবীচি ও কাঠির সাহায্যে) পরবর্তী সংখ্যগুলি অল্প আয়াসেই শেখানো সম্ভব।

একই মাপের ১০টি কাঠি নিয়ে একটি আঁটি বাঁধতে হবে। পরে ১টি দশের আঁটি ও ১টি খোলা কাঠি পাশাপাশি রেখে শিশুদের বলতে হবে যে একটি দশের আঁটি ও একটি খোলা কাঠি একত্রে হয় ১১টি।

অর্থাৎ ১০, কেবল মাত্র এক দশ, তার বেশী নয়।

কিন্তু ১১ হচ্ছে এক দশ আর এক।

এই ভাবে ১২, এক দশ আর দুই ইত্যাদি ভেঙে ভেঙে ছেলেদের বুঝিয়ে দিতে হবে।

১১ থেকে ১৯ পর্যন্ত সংখ্যা ঐ ভাবে একে একে শেখাতে হবে। ২০ হলে ২টি দশের আঁটি পাশাপাশি রেখে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, দুই দশে ২০ হয়। এই ভাবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিশুদের মনে নির্ভুল সংখ্যার ধারণা জন্মাবে।

এই পদ্ধতিতে একটু একটু করে ৩, ৪ থেকে আরম্ভ করে ৫-এর ঘর পর্যন্ত সমস্ত ঘরের সংখ্যাগুলি শিশুরা শিখে ফেলবে।

এই সময় সংখ্যাগুলিও শেখানোর অভ্যাস করতে হবে। কেননা একক ও দশকের ঘরের সংখ্যাগুলির স্থান পরিবর্তনের সংগে যে কত রদ-বদল হয়, তা শিশুদের ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে। যেমন—

২১ দু' দশ আর এক = ২১, এখানে ১কে দশকের ঘরে আনলে হবে ১২ ; এই ভাবে দেখাতে হবে—

১৩
১৪
১৫
১৬
১৭ ইত্যাদি

স্থান পরিবর্তনের ফলে ঐ সংখ্যাগুলি দাঁড়াবে ঃ—

৩১
৪১
৫১
৬১
৭১

সংখ্যার এই বিশেষ অবস্থানের ধারণা না থাকলে, ছেলেদের ৩১ লিখতে বললে, হয় লিখে ফেলবে—প্রথমে ১ ও পরে ৩ অর্থাৎ ১৩।

১০, ২০, ৩০ ইত্যাদি সংখ্যাগুলির সুস্পষ্ট ধারণা শিশুদের হলে দশ দশ করে ১০০ পর্যন্ত গুণতে বলতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন হবে ১০টি দশের আঁটি। ১০-এর সঠিক জ্ঞান দিতে না পারলে, পরবর্তী সংখ্যাগুলি শেখানো মুস্কিল হবে।

যোগের ধারণা ঃ

কাজের মাধ্যমে সংখ্যা গণনা শেখানোর সময়, পরোক্ষভাবে শিশুদের মনে কিছু কিছু যোগের ধারণা আসে। যেমন ১০-এর ১টি আঁটির সঙ্গে আর একটি খোলা কাঠি দিলে হয় ১১ ; এ যোগের ধারণা অবশ্য সুস্পষ্ট নয়। তাই এই ধাপে আসার সময় ছেলেদের যোগের চিহ্ন ও যোগ জিনিষটি সংগে ঠিকমত পরিচয় করাতে হবে। এতদিন পর্যন্ত শিশুরা কোন চিহ্নের কথাই শোনে নি। চিহ্নগুলি কেন ব্যবহার করা হয়, শিশুদের তা ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে। দুই-এর সাথে দুই যোগ করলে হয় চার ; এত বড় কথা না লিখে কাজের

সুবিধার জন্য লিখতে হয় ২+২=৪ ; অর্থাৎ (+) চিহ্নটি যোগের কথার নির্দেশ দেয়, ও (=) চিহ্নটি সমানের বদলে লিখতে হয়।

যোগ শেখানোর সময় প্রথম দিকে এমন প্রশ্ন করা উচিত নয়, যার যোগফল ১০-এর বেশী হয়। কাঁইবীচি, পাথরের টুকরো, কাঠি ইত্যাদির সাহায্যে শিশুদের যোগ শিখাতে হবে। এই সময় ছোট ছোট কথার অঙ্ক দিতে পারলে ভালো হয়, যেমন :—

২টি কাঁইবীচির সংগে আর একটি কাঁইবীচি মিশালে কত হয়? ২+১=৩।

৫টি কাঠির সাথে আর একটি কাঠি রাখলে কত হয়? ৫+১=৬।

এই যে ২ ও ১ যোগ করলে তিন হয়, এই জিনিষটা উপকরণের সাহায্যে শিশুদের ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে। প্রথম দিকে লেখার কোন দরকার নেই। এই ভাবে অঙ্ক শেখানোর পর যখন বুঝা যাবে যে, শিশুরা ব্যাপারটা ঠিকমত ধরতে পেরেছে, তখনই লিখিত আকারে নিম্নলিখিত অঙ্কগুলি দিতে হবে। যেমন :—

২+১=৩
৩+২=৫
২+৫=৭
৬+৩=৯
৪+৪=৮ ইত্যাদি।

যোগের বাক্স

এই ধরণের ছোট ছোট যোগগুলি আরও বহু ভাবে করানো যায়। ঢাকনা দেওয়া একটি বড় কার্ডবোর্ডের বাক্সের দু'দিকে দু'টি গোল ছিদ্র থাকবে। বাক্সের মাঝখানে থাকবে যোগের যুক্ত চিহ্ন, আর বাক্সের শেষে (=) সমান চিহ্নের নিকট একটি প্রায় চৌক ছিদ্র থাকবে, সেখানে সংখ্যা লেখা কার্ড বসানোর ব্যবস্থা আছে। এইবার একটি ছেলের হাতে ৪টি লাল ও ৪টি কালো মারবেল দিতে হবে। তারপর ছেলেটি শিক্ষক মহাশয়ের নির্দেশ মত এক এক করে গুণে গুণে দুটি গর্তে বিভিন্ন রঙের মারবেলগুলি ফেলে দেবে। তার পর শিক্ষক মহাশয় বাক্সের ঢাকনা খুলে দুই পকেটের মারবেল-গুলিকে একত্র করতে বলবেন। তারপর মারবেলগুলি গণনা করে যে সংখ্যা পাওয়া যাবে, সেই সংখ্যাটি যোগফলের ঘরে বসাতে হবে। এই ভাবে শিশুদের মনে + 'যোগ' ও 'সমানের' = চিহ্ন সম্বন্ধে একটা ধারণা আসবে এবং তারা যোগ করতে শিখবে। তারপর কেমন করে ৮ সংখ্যাটি পাওয়া গেল, তা এই ভাবে শিক্ষক মহাশয় দেখিয়ে দেবেন, যেমন—

$$৪+৪=৮$$

অথবা—

$$\begin{array}{r} ৪ \\ +৪ \\ \hline ৮ \end{array}$$

চৌক কাঠের টুকরোর সাহায্যে যোগ ঃ

১, ২, ৩, ৪ সংখ্যা লেখা ৫০টি চৌক কাঠের প্রয়োজন। একাধিক চৌক কাঠের টুকরোর উপর একই সংখ্যা লেখা থাকবে। কাঠের টুকরোগুলি ছেলেদের বিপরীত দিকে এক সারিতে সাজাতে হবে। পালাক্রমে শিক্ষক মহাশয় প্রত্যেকটি ছাত্রকে দু'টি কাঠের টুকরো আনতে বলবেন। প্রত্যেককের কাঠের টুকরোগুলি আনা হ'লে, শিক্ষক মহাশয় বলবেন, যে যে সংখ্যার কাঠের টুকরো এনেছো, সেই সংখ্যা দু'টি যুক্ত চিহ্ন দিয়ে পাশাপাশি লেখো। মনে করা যাক একজন ২ ও ৩ সংখ্যার কাঠের টুকরো এনেছে। সে তখন লিখলো, যেমন—

২+৩= ?

অথবা অন্যান্য ছাত্ররা নিজ নিজ শ্লেটে নিম্নলিখিত সংখ্যা গুলি লিখলো :—

৪+৪=
৩+৬=
২+৪=
৫+৬=

সব ছাত্রদের ঐ অঙ্কগুলি কষা হ'লে, শিক্ষক মহাশয় আর একটু ঘুরিয়ে ঐ ধরনের অঙ্ক দেবেন। সেই অঙ্কের যোগফল সমেত তিনটি সংখ্যার মধ্যে একটি সংখ্যা মুছে দিয়ে বলবেন,

৩+* সংখ্যার সংগে আর কত যোগ করলে সাত হবে ইত্যাদি। অথবা বলবেন নিম্নলিখিত অঙ্কের যে যে সংখ্যা মুছে গিয়েছে, (তারকা চিহ্নিত অংশের সংখ্যা গুলি মুছে গিয়েছে,) সেগুলি বার কর দেখি।

নিম্নে অঙ্কের নমুনা দেওয়া গেল :—

৪+*=৭

৫+*=৯

*+২=৫

*+৪=৬

এই ভাবে যোগ সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্ট হ'লে, ক্রমশঃ কঠিন অঙ্ক দিতে হবে। এই সময় অপেক্ষাকৃত অগ্রসর ছাত্রদের Sums cards-এর সাহায্যে অঙ্ক কষতে দেওয়া উচিত।

এ পর্যন্ত কেবল এককের ঘরের যোগের কথা বলা হয়েছে। এবার দশকের ঘরের যোগের প্রথম পর্যায়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে হাতে রাখার কোন অঙ্ক দেওয়া ঠিক হবে না। যেমন—

২২	১৩
৩৩	৫৬ ইত্যাদি।

ঐ যোগগুলি উপকরণের সাহায্যে সহজেই করানো যেতে পারে। ২২ অর্থে 'দুই দশ' ও 'দুই' এবং ৩৩ অর্থে তিন দশ ও তিন। প্রথমে শিশুরা যথাক্রমে ২ এবং ৩টি খোলা কাঠি একত্র করে দেখবে কত হয় এবং সেই যোগফল 'একক'কে'র ঘরে বসাবে। পরে দশকের আঁটিগুলি যোগ করে যা হবে, তা 'দশক'কের ঘরে বসাবে।

এই ভাবে শিশুদের বুঝিয়ে দেওয়ার পর ঐ ধরণের কিছু কিছু যোগের অঙ্ক কষাতে হবে। এখানেও সামস্ কার্ডের ব্যবহার করা যেতে পারে।

এর পরেই হাতে রাখার যোগ শেখাতে হবে। প্রথমে 'দশককে'র ঘর নিয়ে আরম্ভ করতে হবে। যেমন—

১৮
১২
৩০

এককের ঘরের উপরের ৮ ও নীচের ২ যোগ করলে দাঁড়ায় ১০ অর্থাৎ এক দশ। দশের শূন্য নামে, হাতের এক অর্থাৎ দশক বাঁ দিকের দশককের ঘরের সংগে যোগ হবে। অর্থাৎ ১+১=২+(১) হাতের এক দশ—এই সমস্ত মিলে দাঁড়ায় ৩ দশ। এবার দশককের নীচে ৩ বসালে যোগফল দাঁড়াবে ৩০। ওটাই হবে যোগফল অর্থাৎ উত্তর। এই হাতে রাখার একাধিক যোগ করানোর পর অপেক্ষাকৃত বড় যোগ দিতে হবে। এ সময় শিক্ষক মহাশয়কে খুব হুঁসিয়ার হতে হবে। শ্রেণী-প্রগতির জন্য তাড়াতাড়ি করলে চলবে না।

এর পর শিশুদের ৩।৪ লাইনের যোগ দিতে হবে। নীচে একটি নমুনা দেওয়া গেল :—

(১)	১১	(২)	১৪
	৮		২৩
	৩		১৫
	২২		৯
			৬১

ঐ অঙ্কগুলি কাঠি বা কাঁইবীচির সাহায্যে করানো যেতে পারে। এই ভাবে যোগের ধারণা স্পষ্ট হলে, তারা মুখে মুখে হিসাব করেই যোগ করতে পারবে।

তার পর শিক্ষক যখন বুঝবেন যে, ছেলেরা সব রকমের যোগ ভালো ভাবেই করতে পারছে, তখন তাদের সাহায্যে একটি যোগের বই তৈরী করাতে হবে। এক এক পৃষ্ঠায় এক একটি সংখ্যার যোগ থাকবে। এই সময় শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদের দ্বারাই অঙ্কের যোগফল ঠিক আছে কিনা, পরীক্ষা করাবেন। অর্থাৎ রামের খাতা শ্যামের দ্বারা পরীক্ষা করাতে হবে। বড় বড় অঙ্ক করানোর পর, ছাত্রদের কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার সুযোগ দিতে হবে। একটানা অনেকগুলি অঙ্ক কষানো ঠিক হবে না। একটানা অঙ্ক কষালে ছেলেদের মধ্যে এক ঘেয়েমির বিরক্তি আসতে পারে।

বিয়োগ

ছেলেরা ভালো ভাবে যোগ করতে শিখলে, তাদের বিয়োগ শিখাতে হবে। অবশ্য যোগ করার সময় প্রকারান্তরে ছেলেরা বিয়োগেরও আভাস পেয়েছে। সে ধারণা কিন্তু স্পষ্টও নয় এবং কার্যকরীও নয়।

কারণ যোগ যতটা সোজা, বিয়োগ ততটা সহজ নয়। কেননা বিয়োগের পদ্ধতি কিছুটা স্বতন্ত্র। একই বিয়োগ নানা ভাবে করানো যেতে পারে। যেমন :—

(১) ৮ থেকে ৩ বিয়োগ করলে কত থাকে ?

(২) ৫এর সাথে কত যোগ করলে ৯ হয় ?

(৩) ৮ হাত লম্বা একটি লাঠি এবং পাঁচ হাত লম্বা একটি লাঠি আছে, এর মধ্যে কোনটি বড় ? কত বড় ?

উপরের ৩টি অঙ্কের নমুনাই পরখ করলে দেখা যাবে যে, ১নং অঙ্কটি একেবারে সোজাসুজি ভাবে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ ৮ থেকে ৩ বিয়োগ করার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্কটি যোগের নামান্তর মাত্র। তিন নম্বরের অঙ্কটি হচ্ছে তুলনামূলক।

কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে, একই অঙ্ক নানাভাবে করানো যায়। ঐ তিন রকমের অঙ্কই ছেলেদের একবারে দেওয়া উচিত নয়। একে একে এটার পর অন্যটি করাতে হবে।

যে সমস্ত উপকরণের সাহায্যে ছেলেরা যোগ করেছে, বিয়োগ শেখানোর সময় সেগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে। একই জিনিষের সাহায্যে যে দুই রকমের অঙ্ক কষা যায়, এ চিন্তা করে শিশুরা যথেষ্ট আনন্দ পাবে।

যোগ ও বিয়োগের মূল পার্থক্য হচ্ছে যোগ বাড়ে, বিয়োগ কমে। যেমন ২ ও ৩টি কাঁইবীচি একত্র করলে দাঁড়ায় ৫ ; এখানে সংখ্যাটি বৃদ্ধি পেয়েছে। পক্ষান্তরে বলা যেতে পারে যে, ৩টি কাঁইবীচি থেকে ২টি কাঁইবীচি সরিয়ে নিলে দাঁড়ায় ১, অর্থাৎ এখানে ৩ সংখ্যাটি কমে হয়েছে ১। এটা বার বার শিশুদের বুঝিয়ে দিতে হবে। কার্ডের সাহায্যেও এই বিয়োগ করানো যেতে পারে। যেমন, একটি ছেলের হাতে ৮টি কার্ড দেওয়া হলো, তার পর তা' থেকে ৪টি কার্ড সরিয়ে রাখা হ'লো। তারপর ছেলেটিকে গুণতে বলা হ'লো,

সে গুণে বললো ৪টি আছে। তখন শিক্ষক মহাশয় জিজ্ঞাসা করবেন, 'তোমাকে ক'টি কার্ড দেওয়া হয়েছিল? ৮টি, না? তার থেকে ৪টি সরিয়ে রাখার পর এখন ক'টি আছে? ছেলেটি তখন বললো ৪টি। তখন শিক্ষক মহাশয় জিজ্ঞাসা করবেন, তা হ'লে ৮ থেকে ৪ গেলে কত থাকে? এই ভাবে শিশুদের বিয়োগ শেখাতে হবে। তারপর নানা উপকরণের সাহায্যে শিশুদের ছোট ছোট বিয়োগ করতে দিতে হবে। যোগের মতই প্রথম দিকে হাতে না রেখে যে বিয়োগ করা যায়, সেই বিয়োগগুলি করতে দিতে হবে। বিয়োগ সম্পর্কে ধারণা একটু স্পষ্ট হলে, বিয়োগের চিহ্নটির (—) সাথে পরিচয় করাতে হবে। পাশাপাশি ও নীচে নীচে দু' ভাবে লিখেই বিয়োগ করাতে হবে। যেমন:—

৬—২=৪ ; অথবা ৬

—২

———

৪

এই ধরনের অঙ্ক কষতে শিখলে সাম্‌স কার্ডের সাহায্য নিতে হবে। এই সময় শিশুরা যাতে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই অঙ্কগুলি কষতে পারে, তা দেখতে হবে। প্রয়োজন হলে তারা উপকরণের সাহায্যও নিতে পারে। ছেলেরা যাতে উপকরণের সাহায্য না নিয়েই অঙ্ক কষতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এক একটি কার্ডে ৫টির বেশী অঙ্ক দেওয়া উচিত নয়।

বিভিন্ন স্তরে কি ধরনের বিয়োগ দেওয়া উচিত, নীচে তার নমুনা দেওয়া গেল।

বিয়োগ কর :—কত থেকে কত বাদ দিলে নীচের সংখ্যাটি পাওয়া যাবে? কোন্ কোন্ সংখ্যার বিয়োগফল তিন হবে?

৮—৫=*	৮—*=৩	*—*=৩
৭—৪=*	৬—*=৩	*—*=৩
৮—৫=*	৯—*=৩	*—*=৩
৪—১=*	৪—*=৩	*—*=৩
৫—২=*	৫—*=৩	*—*=৩

এক একটি ধাপের অঙ্ক যখন শিশুরা সহজেই কষতে পারবে, তখন অন্য ধাপের অঙ্ক দিতে হবে। একই দিনে একাধিক ধাপের অঙ্ক দেওয়া উচিত নয়।

এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে যাওয়ার জন্য যেটুকু সময় লাগে, সে সময়টুকু দিতে হবে। কোন ক্ষেত্রেই তাড়াতাড়ি করলে চলবে না।

এর পর শিশুরা দশককের ঘরের বিয়োগ করবে, কিন্তু এখানেও হাতে রাখার অঙ্ক দেওয়া উচিত হবে না।

নীচে একটি সামস্ কার্ডের নমুনা দেওয়া গেল, 'দশককে'র সংখ্যা থেকে ধার না করেও এই অঙ্কগুলি কষা যাবে :—

২৪—১১=?

১৬—১০=?

১৯—১৫=?

২১—১০=?

২৭—১৬=?

২৯—১৮=?

হবে। এর পরই ২×৪=৮; ৩×৩=৯ ইত্যাদি দেখিয়ে দিতে হবে। যোগ ও গুণের চিহ্ন প্রায় একই রকমের, কাজেই ঐ পার্থক্যটুকু শিশুরা যাতে ধরতে পারে, সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। এই ধরণের ছোট ছোট গুণ করতে শিখলে, কার্ডের সাহায্যে অঙ্ক কষাতে হবে। যেমন—

১। ২+২+২   *×*=৬

৩+৩+৩=   *×*=৯

৪+৪+৪+৪=   *+*=১৬

নীচের দ্বিতীয় উদাহরণে কেবল যোগফল দেওয়া আছে, শিশুরা শুধু গুণের আকারে লিখবে। যেমন :—

২। ২×৪= ?   =৮

৩×২= ?   =৬

৪×৫= ?   =২০

শিশুদের কাজ ও খেলার মাধ্যমে প্রসংগক্রমে গুণের অঙ্ক শেখাতে পারলে ভালো হয়। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি নমুনা দেওয়া গেল :—

(ক) প্রত্যেককের যদি ২টি হাত থাকে
তাহ'লে ৫ জনের ক'টি হাত হবে ?

(খ) একটি ঘোড়ার ৪টি পা,
৫টি ঘোড়ার কয়টি পা ?

(গ) প্রত্যেকের যদি ২টি চোখ থাকে,
তবে তিনজনের ক'টি চোখ ?

এর পরই আসে নামতা শেখানোর কথা। সারা জীবনই যখন নামতার প্রয়োজন হয়, তখন ছোট বয়সে ভালো করে নামতা শেখানো উচিত। তোতা পাখীর মত (না বুঝিয়েই) নামতা মুখস্থ করানো উচিত নয়। উপকরণের সাহায্যে বা অন্যান্য চিত্তাকর্ষক উপায়ে নামতা শেখাতে পারলে খুবই ভালো হয়। নিম্নলিখিতভাবে ২-এর ঘরের নামতা ছেলেদের দিয়ে লেখাতে হবে :

এই যোগফল নামতায় রূপান্তরিত করতে হবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
২	৪	৬	৮	১০	১২	১৪	১৬	১৮	২০

নামতা : (কি ভাবে গুণের দ্বারা ঐ যোগফলকে সংক্ষিপ্ত করা গেল, তা বুঝিয়ে দিতে হবে।)

২	২	২	২	২	২	২	২	২	২
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
২	৪	৬	৮	১০	১২	১৪	১৬	১৮	২০

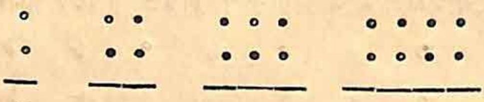
অনুরূপভাবেই ছেলেরা ৩-এর ঘরের যোগফল দেখে নামতা শিখবে :—

১	২	৩	৪	৫
১	২	৩	৪	৫
১	২	৩	৪	৫
—	—	—	—	—
৩	৬	৯	১২	১৫

ওর পরিবর্তে লিখবে :— (প্রতি বারেই ১ তিন বার, ২ তিন বার, ৪ তিন বার, ৫ তিন বার আছে, কাজেই ৩×১, ৩×২, ৪×৩, ৫×৩ গুণ করতে হবে।)

৩	৩	৩	৩	৩
১	২	৩	৪	৫
৩	৬	৯	১২	১৫

কাঁইবীচির সাহায্যেও ২-এর ঘরের নামতা লেখা যায়। যথা—



২ ৪ ৬ ৮

নামতা তাড়াতাড়ি শেখানো উচিত নয়। বার বার অনুশীলনের দ্বারা তা আয়ত্ত করাতে হয়। এ ছাড়া ছড়ার সাহায্যে নামতা পড়ানো যায়। যেমন—

চার এক্কে চার হয়,
চার দুগুণে আট কয়।
চার তিনে বারো ভাই,
চার চারে ষোল পাই। ইত্যাদি

যখন বুঝা যাবে যে, শিশুরা বেশ খানিকটা নামতা শিখছে, তখন 'সামস্ কার্ডে'র ব্যবহার করতে হবে। যেমন—

৬×২=
৩×৮=
২×৭=
৪×৫=

এখান থেকে উপকরণের সাহায্য ছাড়া শিশুরা যাতে উপরের গুণগুলি করতে পারে, তা দেখতে হবে। যারা উপকরণের সাহায্য ছাড়া অঙ্কগুলি কষতে পারবে না, কেবল তাদেরই উপকরণ দিয়ে সাহায্য করতে হবে।

এর পর ছেলেদের যে কোন একটি সংখ্যার কথা বলতে হবে। সেগুলি কতরকম ভাবে ভেঙে লেখা যায়, তা দেখিয়ে দিতে হবে ; তারপর অন্যান্য সংখ্যাগুলি ছেলেদের নানাভাবে ভেঙে দেখাতে বলতে হবে। যেমন উদাহরণ—

৮ = ৮ × ১
৪ × ২
২ × ৪

নামতাগুলি ভালো করে রপ্ত করানোর জন্য চার্টের সাহায্য নিতে হবে। শিক্ষকদেরও মাথা খাটিয়ে নানা ধরণের চার্ট তৈরী করে নিতে হবে। বুঝানোর সুবিধার জন্য এখানে দুটি চার্ট দেওয়া গেল :—

(১)

×	০	১	২	৩	৪	৫
২	০	২	৪	৬	৮	১০
৩	০	৩	৬	৯	১২	১৫
৪	০	৪	৮	১২	১৬	২০
৫	০	৫	১০	১৫	২০	২৫

(২)

×	৪	৩	৯	৬	৮	৭
৮						
৬						
৩						
২						

২নং-এর শূন্য ঘরে ছেলেরা নামতার উত্তর লিখবে।

এইবার শিশুদের ছোট ছোট গুণ দিতে হবে। প্রথম দিকে হাতে কিছু না থাকে, সেই ধরণের গুণ করতে দেওয়া

উচিত। শিক্ষক প্রথমে কয়েকটি অঙ্ক বোর্ডে কষে দেখাবেন এবং সংখ্যাগুলি বসানোর সময় ব্যক্তিগতভাবে ছেলেদের জিজ্ঞাসা করবেন, কোনখানে কত বসাতে হবে। একজন না পারলে, পাশের জনকে জিজ্ঞাসা করবেন। তারপর শিশুদের অঙ্ক করতে দিতে হবে ঃ—

১৩	১২	২২	২৩
৩	২	৪	২

এরপর আসবে হাতে রাখার গুণ। হাতে রাখা যোগের সময় যেভাবে ছেলেদের বুঝানো হয়েছে, এখানে তার পুনরাবৃত্তি করতে হবে। তারপর অঙ্ক কষতে দিতে হবে ; যেমন—

২৪	৩৬	১২৮	২৬৭
৪	৬	২	৩

সব শেষে দু'ঘর বা বেশী সংখ্যার গুণ দিতে হবে। দু'রকম ভাবে এই গুণ করানো যেতে পারে। যথা—

২৭৩	২৭৩
২৭	২৭
৫৪৬×	১৯১১
১৯১১	৫৪৬×
৭৩৭১	৭৩৭১

এই সময় শিশুদের ১০, ২০, ৩০ ইত্যাদি সংখ্যার দ্বারা গুণের সহজ রীতি গুলিও শিখিয়ে দিতে হবে, যেমন—

৫৫ × ১০ = ৫৫০ এখানে বাঁ দিকের সংখ্যা দুটির সংগে
৫৫ × ২০ = একটি শূন্য দিয়ে গুণফল পাওয়া গেছে।
৫৫ × ২ = ১১০ + ০ = ১,১০০
৫৫ × ৩০ =
৫৫ × ৩ = ১৬৫ + ০ = ১৬৫০ এই ভাবে দশককের উর্ধ্বের অন্যান্য দশককের গুণফল বার করা যায়।

ভাগ

অঙ্কের প্রাথমিক চারটি ভাগের মধ্যে ভাগই সর্বাপেক্ষা জটিল। কেননা ভাগের সংগে গুণ ও বিয়োগের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। কাজেই গুণ ও বিয়োগ ভালোভাবে না শিখলে, ভাগ শেখানো যায় না। ছেলেরা যখন যোগ বিয়োগ ভালো-ভাবে শিখবে, তখনই তাদের ভাগ শেখাতে হবে।

ব্যবহারিক উদাহরণের সাহায্যে ভাগের ধারণা দিতে হবে। প্রথমে ছেলেদের একটি লম্বা কাঠি দেখাতে হবে, পরে সেই কাঠিটি ১০ ভাগ করে ছেলেদের ভাগের অর্থ বুঝিয়ে দিতে হবে। তারপর জিজ্ঞাসা করতে হবে যে, এই দশ ভাগের অর্ধেক কত? ছেলেরা তখন ঐ সমান দু'ভাগের একটি ভাগের কাঠি গুণে বলবে ৫; তখন শিক্ষক বলবেন, বেশ, তাহ'লে ১০টি কাঠিকে দু'ভাগ করলে অথবা ১০টি কাঠিকে দু'টি কাঠি দিয়ে ভাগ করলে, ভাগফল দাঁড়ায় পাঁচ। শ্রেণীর ছাত্রদের নিয়েও ভাগের ধারণা দেওয়া যায়। এ ছাড়া কাঁইবীচি ও নুড়ি পাথরের দ্বারা ভাগ শেখানোর কাজ চলতে পারে।

শিশুরা যখন ভাগ ব্যাপারটা কি, তা বুঝতে পারবে, তখন

ভাগের চিহ্নসহ কি ভাবে ভাগ করতে হয়, তা দেখিয়ে দিতে হবে। যেমন—

৮÷২=৪ অথবা ২) ৮ (৪
৮
———
৮÷৪=২ অথবা ৪) ৮ (২
৮
———

গুণের নামতার সংগে ভাগের যে একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে, তা শিশুদের বুঝিয়ে দিতে হবে। ২-এর ঘরের নামতা শিশুরা বলবে ও দুই চারে আট হয়, শিশুরা বলতে পারলে, দুটি জিনিষ পাশাপাশি লিখে দেখাতে হবে,—

২×৪=৮ ৮÷২=৪
৮÷৪=২

নামতার সাহায্যে যে ভাগ করা যায়, শিশুরা যখন বুঝতে শিখবে, তখন তাদের কার্ডের লেখা অঙ্ক দিতে হবে। যেমন—

৬÷২=কত? ৮÷২=কত? ১২÷৩=কত?
১৪÷২=কত? ১৬÷৪=কত?

এর পর আসে ভাগ শেষের কথা। ভাগশেষ যে কি, তা বুঝানোর জন্য শ্রেণীর ৯ জন ছাত্রকে ডাকতে হবে; তারপর চার জন করে সমান দু' ভাগে ভাগ করার পর একজন বাকী থাকবে। ছেলেদের সেটা বুঝিয়ে বলতে হবে যে, ৯ সংখ্যাকে দু' ভাগ করার পর, ১ অবশিষ্ট থাকে। ব্যাপারটা অঙ্কের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে,—

২) ৯ (৪
৮
———
১

ভাগ করার পর যা বেশী থাকে, তাকে অবশিষ্ট বা ভাগশেষ বলে। এই পর্যায়ের অঙ্কগুলি কিছুদিন অনুশীলন করাতে হবে।

পরের ধাপ :—

(ক) ২) ৬৮ (৩৪
৬
৮
৮
———

(খ) ২) ৭০ (৩৫
৬
১০
১০
———

এক্ষেত্রে নামতা আওড়ে ৬৮ পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব নয়। তাই প্রথমে ৬ এর মধ্যে ২ ক'বার যায় দেখা হলো। ৮ নামার পর ৮-এর মধ্যে ২ ক'বার যায়, তা দেখানো হলো। এখানে ভাগ করে সংখ্যা মিলে গেল, তাই অবশিষ্ট কিছু রইলো না।

পরের ধাপে নামতার সাহায্যে করানো যায় এমন অঙ্ক দেওয়া গেল। এখন দেখতে হবে ৪, ৩৬-এর মধ্যে ক'বার যায় ; তাই দেখানো গেল :—

৪) ৩৬ (৯
৩৬
———

পরের ধাপ—

৩) ২৩৪ (৭৮
২১
———
২৪
২৪
———

এবার ০ শূন্যের ব্যবহার শেখাতে হবে।

৩) ৩০৯ (১০৩
৩
———
৯
৯
———

প্রথমে ৩-এর মধ্যে ৩ ১ একবার যায়, এইটুকু ছেলেরা করতে পারবে। পরে ০ শূন্যের মধ্যে ৩ ক'বার যায়, তা করার সময় শিশুরা চিন্তায় পড়বে। শিক্ষক তখন বুঝিয়ে দেবেন '০'কে তিন দিয়ে ভাগ করা যায় না। কাজেই '০' ভাগফলে ০ বার গেলো। পরে ০-এর পাশের ৯ নামলো ; এখন ৯-এর মধ্যে ৩ ক'বার যায়, তা লেখা হলো।

'০' সংখ্যার সংগে ছেলেদের পরিচয় করানোর জন্য '০' সমন্বিত আরও কতকগুলি অঙ্ক দেওয়া গেল—

(১) ৩) ৬১৯ (

(২) ৩) ২০৩ (

এর পর আসে বড় বড় ভাগের কথা। শিক্ষক মহাশয় এবার নিজে বোর্ডে কতকগুলি অঙ্ক করে দেখাবেন। তারপর ছেলেদের কতকগুলি অঙ্ক কষতে দেবেন। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ যে অঙ্কই হোক না কেন, অঙ্ক কষানোর সময় কোন ধাপের পর কোন্ ধাপ আসবে, তা দেখিয়ে দিতে হবে। এখানে লক্ষণীয় এই যে, শিক্ষক কি বুঝালেন, সেটা বড় কথা নয়, ছেলেরা কি বুঝলো সেটাই দেখতে হবে।

প্রকল্প-পদ্ধতির (Project Method) সাহায্যে টাকা আনার জ্ঞান দান—ডাকঘরের খেলা : প্রকল্প-পদ্ধতির সাহায্যে অতি সহজেই টাকা আনা পয়সার ধারণা দেওয়া যায়। ডাকঘরের জন্য যে যে উপকরণের প্রয়োজন, তা ছেলেদের দ্বারা সংগ্রহ করাতে হবে। তারপর একজন হবে পোষ্ট মাষ্টার। তার কাছে থাকবে কতকগুলি খাম, পোষ্টকার্ড,

টিকিট ইত্যাদি। একজন এসে বলবে তু' আনার খাম দাও। ছেলেটি দিল একটি আধুলি। এবার পোষ্ট মাষ্টারকে বাকী পয়সা ফেরৎ দিতে হবে। কাজের শেষে বিক্রীরও হিসাব করতে হবে। এই ভাবে টাকা আনার ব্যবহারিক প্রয়োগ ও লেন-দেনের সাহায্যে শিশুদের মনে টাকা আনা পয়সার স্পষ্ট ধারণা জন্মাবে। এর জন্য টাকা, আনা, পয়সা (কার্ডবোর্ডের সাহায্যে) তৈরী করতে হবে। দোকান ও বাস প্রকল্পের সাহায্যেও অনুরূপ ভাবে টাকা আনা পয়সার যোগ বিয়োগ শেখানো যায়।

বল ফ্রেমের সাহায্যে সংখ্যা গণনা এবং যোগ-বিয়োগ শিক্ষা

বলফ্রেমের সাহায্যে সহজে ও ভালো ভাবে শিশুদের সংখ্যা গণনা শেখানো যায়। এখন দেখা যাক, কি ভাবে সংখ্যা গণনা, যোগ এবং বিয়োগ শেখানো যায়। বলফ্রেমের দশটি লাইনে দশটি করে ১০০টি ঘুঁটি আছে। বাঁ দিকের ফ্রেমে ঘুঁটিগুলি একপাশে সরানো আছে। সংখ্যা গণনার সময় একটি একটি করে ডানদিকে ঘুঁটিগুলি সরিয়ে ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি করে ছেলেদের হেঁকে হেঁকে গণনা করতে বলতে হবে। এইভাবে ১০০ পর্যন্ত গুণতে শিখলে, তাদের যোগের ধারণা দিতে হবে। প্রথম সারির এক দশ গুণা হলে, দ্বিতীয় সারির এক, তুই করে তিনটি ঘুঁটি সরিয়ে শেখাতে হবে, এক দশ আর+১=১১, ১০+২=১২, ১০+৩=১৩ ইত্যাদি। এইভাবে ক্রমিক সংখ্যা

গুণতে শিখলে, যোগ করাতে হবে। মনে করা যাক, বল ফ্রেমের ৪ ও ৫ সারির ৪টি ৪টি ঘুঁটি ডানদিকে সরানো হয়েছে। এখন ৪+৪ কত হয়, তা জিজ্ঞাসা করলে, ছেলেরা ঐ দুই সারির ডান দিকের ঘুঁটিগুলি গণনা করে বলবে ৪ আর ৪-এ ৮ হয়। এই ভাবে যোগ শেখানো যায়। এইবার কয়েকটি অনুশীলনী অঙ্ক দিতে হবে। যথা—

৪+৩=কত

৪+৫=কত

তার পর ১০+৮=কত

যোগ সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হ'লে, বিয়োগ শেখাতে হবে। ডানদিকের ১০টি ঘুঁটির মধ্যে তিনটি বাঁ দিকে সরানো হয়েছে। এখন জিজ্ঞাসা করতে হবে যে, ডান দিকের ১০টি ঘুঁটির মধ্যে তিনটি ঘুঁটি সরানো হয়েছে, এখন ডান দিকের সারিতে ক'টা ঘুঁটি আছে। ছেলেরা ডান দিকের ঘুঁটি গণনা করে বলবে ৭টি ঘুঁটি আছে? এই ভাবে বিয়োগের ধারণা দিতে হবে। তারপর নিম্নলিখিত অনুশীলনী অঙ্ক দিতে হবে। যথা—

১০—৬=কত

১০—৭=কত

৮—৪=কত ইত্যাদি।

॥ চিত্রাংকন শিক্ষা ॥

Art is expression infused with human soul.

⁂

Art sublimates the limited verbal language.

⁂

"What is it that the child first tries to represent? Things that are attractive in colour, things round which its pleasurable associations most cluster—human beings from whom it has received so many emotions."

⁂

কলা-বিদ্যা যেখানে একেশ্বরী, সেখানেই তার পূর্ণ গৌরব। অন্য কোন কলা-বিদ্যার সংগে তাকে মিলাতে গেলে তার গৌরব হানি হয়। সতীনের সংগে ঘর করতে গেলেই, তাকে খাটো হতেই হবে।

—রবীন্দ্রনাথ

⁂

যার দৃষ্টি আছে, সে সৃষ্টি করতে পারে। শিল্পীর সৃষ্টি যদি দর্শককের মনে সৃষ্টির উদ্রেক না করে, তবে তার শিল্প ব্যর্থ।

⁂

শিশুর ভাষা চিত্রধর্মী। ছবিটাই তার উপলব্ধির প্রথম ভাষা।

চিত্রাংকনটা শিশুশিক্ষার অপরিহার্য অংগ। অথচ এর প্রতি আমাদের অবহেলা সবচেয়ে বেশী। ছাত্র এবং শিক্ষক কারুর কাছেই এর তেমন সমাদর নেই। কালক্ষেপনের জন্যই সাধারণতঃ ছেলেমেয়েদের ছবি আঁকতে দেওয়া হয়ে থাকে। এর প্রয়োজনীয়তা যে কত, ছেলেরা কি আঁকলো বা শিখলো, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় না মোটেই। ফলে গতানুগতিক পদ্ধতিতে কোন একটি ড্রইং বই থেকে ছেলেরা যা' খুশী ছবি আঁকে; কর্তব্যের খাতিরে শিক্ষক মহাশয় তা দেন সংশোধন করে, কখনও বা তাও হয় না; শিক্ষক মহাশয় স্থাণুর মত শ্রেণীকক্ষে বসে থাকেন, ছেলেরা আপন মনে ছবি এঁকে চলে। নিছক অনুকরণ করে ছেলেরা যে ছবি আঁকে, তা শিক্ষককের কাছে যেমন অর্থহীন, ছেলেমেয়েদের কাছেও তাই। সে ছবিগুলি এমন কতকগুলি রেখার সমষ্টি—যেগুলি আঁকা কেবল কঠিন নয়—যা শিশুর কাছে অসামঞ্জস্যময়, অর্থহীনও বটে। কাজেই অন্ধভাবে তা অনুকরণ করাটা শিশুদের কাছে নেহাৎ পণ্ডশ্রম। যদিও এই ধরণের ছবি আঁকাকে আমরা বড় গলায় 'ফ্রি-হ্যাণ্ড ড্রইং' বলি; তথাপি ভেবে দেখিনা যে, শিক্ষার নামে এখানে কত বড় স্বেচ্ছাচার চলেছে। এ ধরনের ছবি আঁকায় শিশুরা কতখানি লাভবান হ'তে পারে, তা ভাববার কথা নয় কি?

প্রথমেই জানা দরকার শিশুরা কি আঁকে? ছবি আঁকার প্রেরণাই বা আসে কোথা থেকে? কুণ্ডয়ন প্রবৃত্তি থেকেই শিশুরা যেখানে সেখানে হিজিবিজি কাটতে সুরু করে; সেই খেয়ালের বশে আঁকা, বাঁকা বাঁকা রেখায় না থাকে কোন আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, না থাকে তার কোন নির্দিষ্ট রূপায়ণ। না থাকবারই কথা। কারণ সেগুলো হচ্ছে ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত কতকগুলো যা-তা রেখার সমষ্টি। শিশুদের রঙের ব্যবহার সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। আমাদের কাছে তার কোন অর্থ না থাকতে পারে, কিন্তু শিশু-কল্পনায় সেগুলি কত না অর্থে ভরা! ছবি আঁকাটা কেবল কৌশল আয়ত্ত করা নয়, নানাপ্রকার সরঞ্জামের ব্যবহার ও প্রয়োগেরও আনন্দ আছে।

হিজিবিজির পরে আসে রেখা-চিত্র। শিশুর কাছে সেটা ছবি হ'লেও, তা'কে ঠিক ছবির পর্যায়ে ফেলা চলে না। তা হ'লেও সামান্য কয়েকটি রেখার মধ্যে দিয়ে শিশুরা অনেক কিছু প্রকাশ করতে চায়। তার মনের চিত্র-ধর্মী-ভাষা এবং কল্পনা সেই সামান্য কয়েকটি আঁচড়ের মধ্যে দিয়ে রূপায়িত হ'তে আরম্ভ করে। তা ছাড়া কথার চেয়ে চিত্রের মধ্য দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ হয় অসংকোচে। ফলে ছবি আঁকাটা শিশুর কাছে আত্ম-প্রকাশের প্রিয় পন্থা হয়ে ওঠে। কারণ সে চিত্রায়ণের মধ্যে শিশু নিজেকে শুধু প্রকাশই করেনা, সেটা তার কাছে হয়ে ওঠে a kind of graphical language.

লালন-বৎসরান্তে শিশুর ছবি আঁকার দৃষ্টিভংগী বদলায়। শিশু তখন সানন্দে ছবি আঁকায় মেতে ওঠে। ছয় থেকে আট

বছর অবধি তার সে আনন্দ-প্রবাহ থাকে অফুরন্ত। তখনই শিক্ষকদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রয়োজন হয়—একান্ত-ভাবে। সাজ-সরঞ্জামের যেটা যখন প্রয়োজন, তা হাতে হাতে যোগান দিতে পারলে খুবই ভাল হয়। এ সময়ে লক্ষ্য রাখা উচিত ঠিক জিনিষটা তারা পাচ্ছে কি না, যতদূর সম্ভব স্বাধীন-ভাবে বিষয়বস্তু নির্বাচনের পর কেমন করে কি আঁকার চেষ্টা করছে। সে আঁকাটা যা-ই হোক না কেন,—ছবি অাঁকার সময় নানা কথায় তাদের উৎসাহিত করতে হবে ; আর দেখতে হবে কি তারা অাঁকছে ? কারণ পর্যবেক্ষণের সময় মনে রাখতে হবে যে, শিশুরা যা দেখে, ঠিক তাই-ই অাঁকে না ; তারা যা ভাবে, তাই অাঁকে। কাজেই কোন্ বস্তুটা তারা যথাযথভাবে অাঁকতে পারলো বা পারলো না, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন নেই—দেখতে হবে কেমন করে কি এঁকেছে।

বড়দের কাছে চিত্রাংকনটা সাধনা সাপেক্ষ হ'লেও ছোটদের কাছে তা খেলারই সামিল। শিশুর কাছে খেলা আর ছবি অাঁকার মধ্যে কোন তফাৎ নেই। পার্সী নান্‌ও এ কথা সমর্থন করেছেন। বলেছেন, খেলা আর ছবি অাঁকাটা শিশুদের কাছে একই ধরনের ব্যাপার। প্রক্রিয়া দুটোর প্রকাশভংগীটা একটু স্বতন্ত্র হ'লেও, ও দুটোর পরিণামেই আছে সেই একই স্বতঃস্ফূর্ত অভিজ্ঞতার আনন্দ। আট বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা রৈখিক চিত্রায়ণটাই পছন্দ করে বেশী, তার পর থেকে অবশ্য তাদের দৃষ্টি বাস্তবমুখী হয়ে ওঠে।

অবশ্য সেই খেলার মনোভাব পরিণামে চিত্রানুরাগে

রূপান্তরিত হয়। তখনই চিত্রকুশলী শিক্ষককের সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন। হিজিবিজির কিছু পরেই শিশুর মনে ছবি আঁকার যে স্বাভাবিক প্রেরণা আসে, শিশুর কাছে সেটা একটা স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার; তবে তার প্রাথমিক উদ্যমটাই বড় কথা। ডাঃ গুডএনাফ্ও সে কথার উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, শিশুদের আঁকা ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করলেই প্রথমে দর্শককের মনে যে কথার উদয় হয়, সেটা কিন্তু তার প্রচেষ্টার কথা নয়—সেটা হচ্ছে শিশুর আত্ম-প্রকাশের সাহস। আঁকতে আঁকতে শিশুর মনে যে 'স্কিমা' বা বস্তু সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা জন্মে, সেই ধারণা থেকেই তারা ছবি আঁকে; কোন স্থূল বস্তুর অনুকরণে নয়। এ কথা বুলারও বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, প্রাথমিক প্রচেষ্টার সময় হয়তো 'স্কিমা'র প্রয়োজন হ'তে পারে, কিন্তু একটু বয়স হওয়ার পরেও যদি অন্ধভাবে তারই অনুকরণে ছবি আঁকার উৎসাহ দেওয়া যায়, তা হ'লে তার চিত্রে বাস্তব বিমুখী গতানুগতিকতার দোষ আসতে পারে। সত্যিকারের শিল্পীর পক্ষে সেটা অগৌরবের কথা।

এই প্রসংগে আর একটি বিষয় জেনে রাখা দরকার। সেটা হচ্ছে, শিশু-চিত্রে কি বৈশিষ্ট্যের ছাপ থাকে? তার উত্তরে বলা চলে যে, শিশু-চিত্র-শিল্প একান্ত ভাবে শিশুর নিজস্ব স্বকীয়তায় পূর্ণ, সেখানে বড়দের মত কোন নিপুণতা বা সূক্ষ্ম কারিকুরি আশা করা যায় না। তবে সে ছবিগুলি একান্তভাবে শিশুমনের অভিব্যক্তি হলেও শিশু-কল্পনার সে রূপায়ণকে একটা বিশেষ ছাঁচে ফেলা চলে। প্রথম কথা, ছবিগুলির মধ্যে

থেকে শিশুর মনস্তত্ত্বকে আবিষ্কার করা যায়, কারণ শিশুর ভাবনা থেকেই ছবিগুলো সৃষ্টি হয়। কাজেই শিশুর প্রথম হিজিবিজিটাকেও উপেক্ষা করবার জো নেই। কারণ সেটাও যে তার কাঁচা বয়সের অপরিণত ভাষা। অপরিণত ভাষা চিত্র-ধর্মী। কাজেই শিশুদের কাছে কোন বস্তুর সত্যিকার আকৃতির চেয়ে তার মূর্তিটাই সত্য। তাই অর্থহীন রেখাও শিশুর কাছে কত না বিচিত্র অর্থে ভরা! এ ধরনের সব ছবিই অবশ্য শিশুমনের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের নীরব সাক্ষী; কাজেই সেখানে নিয়মানুবর্তিতার শাসন জারী করতে গেলে নিশ্চয় শিশুর কল্পনা হ্রাস হবে। আগ্রহোন্মুখ শিশুর পক্ষে সেটা বিশেষ ক্ষতিকর জেনেই সে বিষয়ে প্রত্যেকটি শিক্ষককে সজাগ হতে হবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—শিশুর প্রথম চিত্রাভিব্যক্তি কি? মানুষের ছবি। নিত্য পরিচিত পরিবেশের মধ্যে শিশু বার বার তার মা বাপকে দেখে। কাজেই তার চিত্রায়ণে প্রথম সেই ছবিটিই ধরা পড়ে। মানুষের পর প্রাণবন্ত প্রাণীর ছবি সে আঁকতে চেষ্টা করে। জীব-জানোয়ারের পর তার দৃষ্টি পড়ে চারি পাশের ঘর বাড়ির দিকে, সে তখন তারই ছবি আঁকতে চায়। তারপর ছবি আঁকায় একটু নিপুণতা এলে সে নানা ধরনের ছবি আঁকতে সুরু করে। শিশুর সে ছবিগুলোকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। যথা—বর্ণনামূলক, বস্তুর প্রতিলেখ, নক্সা বা রঙীন ছবি এবং ব্যাংগ চিত্র।

ছবির মাধ্যমে শিশু তার ভাবাবেগ প্রকাশ করে, কিন্তু

তবুও সেই আত্মপ্রকাশের মধ্যে কিছুটা অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। কেবল যে নিপুণতার অভাবেই শিশু-চিত্রের সৌন্দর্য নষ্ট হয় তা নয়, দৃষ্টিভংগীর পার্থক্যের জন্যই ওটা সংঘটিত হয়। শিশুমনে স্থান-কাল-পাত্রের সঠিক ধারণা জন্মাতেও বেশ কিছু সময় লাগে। তাই ছবির মধ্য দিয়ে শিশুরা সেগুলি ঠিকমত ফুটিয়ে তুলতে পারে না। এইজন্যে শালী বলেছেন যে, শিশুরা কোন কালেই পেশাদার শিল্পী নয়। কাজেই তাদের ছবিতে technical inaccuracies থাকাটাই স্বাভাবিক,—সেখানে স্থান ও সময়ের নির্ভুল চিত্রায়ণও আশা করা যায় না। এই জন্যে শিশুদের আঁকা কোন ছবিতে যদি একই সংগে চাঁদ ও সূর্যের আবির্ভাব হয়, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সাধারণতঃ ছবির দিক থেকে বিচার করলে নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলি শিশু-চিত্রে পরিলক্ষিত হয়। যথা (১) বাস্তব আকৃতিগত সামঞ্জস্য সম্বন্ধে ঔদাসীন্য, (২) বস্তুর কাঠামো সম্বন্ধে অজ্ঞতা, (৩) বস্তুর পরিপ্রেক্ষণ ধারণার অভাব, (৪) দূরত্ব প্রকাশের অক্ষমতা, (৫) চিত্রায়ণ-পরিকল্পনার অভাব এবং (৬) অবাস্তবিমুখীতা।

অন্ধ অনুকরণ শিশু-কল্পনার অন্তরায়। কাজেই শিশুদের স্বাধীনভাবে ছবি আঁকবার সুযোগ দিতে হবে। বিষয়বস্তু নির্বাচন থেকে ছবি আঁকা পর্যন্ত সমস্ত কিছুই শিশুরা যাতে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে করে, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। নিয়মানুবর্তী ছবি আঁকায় শিশুরা আনন্দ তো পায়-ই না, তাদের কল্পনাও ব্যাহত হয়।

তবে 'মডেল' থেকে ছবি আঁকাটা এদিক থেকে একটু স্বতন্ত্র। সেখানে ছেলেরা যাই করুক না কেন, অর্থহীনভাবে তারা কিছু আঁকে না ; সত্যিকারের জিনিষটাকে প্রত্যক্ষ করে রেখার টানে সেটিকে ফুটিয়ে তুলতে চায়। ফলে ছবি আঁকার সংগে সংগে তাদের মনে বস্তুটি সম্বন্ধে একটা বাস্তব ধারণা জন্মায়। শুধু তাই নয়, বস্তুর আকার, গঠন-বৈশিষ্ট্য এবং বর্ণটি পর্য্যন্ত তার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। কিন্তু সেই ছবি আঁকার সময় শ্রেণীকক্ষের পরিবেশটি কেমন থাকে, তা একটু লক্ষ্য করে দেখতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে শ্রেণী পরিবেশটি চিত্রাংকনের অনুকূল থাকে না ; তা ছাড়া ছেলেরা ইচ্ছামত এমনভাবে যেখানে সেখানে বসে পড়ে, তাতে অনেক ছেলেই নিজ নিজ আসনে বসে ঠিকমত 'মডেল'টিকে দেখতে পায় না। ফলে, যত নিখুঁত 'মডেল'ই হোক না কেন, চিত্রাংকনের সময় ছেলেরা মুস্কিলে পড়তে পারে। কেমন ভাবে কোন্ জিনিষটাকে আঁকতে হয়,—তেমন শিক্ষা শিক্ষকও পাননি, অথবা অনভ্যাসের দরুণ হয়তো তিনি ভুলেই গিয়েছেন—তা কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শেখানো হয় না।

আবার, জ্যামিতির ছকে ছবিকে যেখানে ঢালাই করার চেষ্টা হয়, সেখানে শিক্ষক মহাশয় কোন রকমে তা দেখিয়ে দিয়েই খালাস, আর যে কিছু ভেবে দেখবার আছে—তা তিনি মনেই করেন না। বস্তু-মাত্রই যে নিটোল (সলিড) এবং তা প্রকাশেরও একটা সহজ পন্থা আছে, সেটা একটু দেখিয়ে দিলেই শিশুরা সহজেই যে কোন বস্তুর ছবি আঁকতে পারে।

শিশুর মনে বস্তুর পরিপ্রেক্ষণ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা জন্মালে, তারা অতি সহজেই কোন না কোন 'মডেল' থেকে তা আঁকতে পারে ; কিন্তু সে কথাটাই অনেকে বোঝেন না। অনেক বিদ্যালয়ে অবশ্য ব্ল্যাকবোর্ড থেকে শিশুদের ছবি আঁকতে শেখানো হয়, কোথাও বা রং-তুলির ব্যবহারও কিছুটা ছেলেরা শেখে, কিন্তু অনুমান আর নিরানন্দের সংগেই সে শিক্ষা চলে। আবার ছবি আঁকাটাও তেমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় না— যাতে করে শিশুরা তাদের ব্যবহারিক জীবনের সমস্যাগুলোকে কাগজে কলমে সমাধান করতে পারে। জ্যামিতির বই থেকে যে ছবি আঁকতে দেওয়া হয়ে থাকে, তা'র পিছনে কোন উদ্দেশ্যই বড় একটা থাকে না।

ফলে চিত্রাংকনের পদ্ধতি সম্বন্ধে শিশুরা সম্যক অবহিত হ'তে পারে না। তাছাড়া অন্ধভাবে অনুকরণ করে শিশুরা আনন্দ তো পায়-ই না, বরং পর্যবেক্ষণ শক্তিও হারিয়ে ফেলে। সেটা কিন্তু সত্যিকার শিল্পীর পক্ষে ভয়ানক মারাত্মক। কারণ অনুভূতির রঙে যার কিছু উপলব্ধি হলো না, বস্তুর আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যটুকু যার চোখে ধরা পড়লো না, রূপের ধ্যানে যার চোখ বিমুগ্ধ হ'ল না—সৌন্দর্যের জগতে তার উপলব্ধি রইলো অন্ধ হয়ে! তাই চিত্রাংকনের কথা প্রসংগে একজন শিল্পী বলেছেন যে, চোখ খুলে ছেলেদের দেখতে শেখাও, অন্তর দিয়ে সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে দাও, প্রতিটি রূপ-রেখার অর্থ সে বুঝুক ; শুধু তাই নয়, যার যেদিকে জন্মগত ঐকান্তিক প্রবণতা আছে, সেই সম্ভাবনার দিকে তার জীবনকে পরিচালিত কর ;

বস্তুর আকৃতি, বর্ণ এবং তার সমাবেশ সম্বন্ধেও যাতে তার মনে একটা ধারণা জন্মে, সে দিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত।

চিত্রাংকনের কোন একটি পদ্ধতি অনুসরণ করবার আগে তার উদ্দেশ্য ও সম্ভাবনার বিষয় ভালভাবে জেনে নেওয়া দরকার। এর জন্য সুপরিকল্পিত পরিকল্পনারও কিছুটা প্রয়োজন আছে। চিত্রাংকন শিক্ষা-পরিকল্পনার নির্দেশমত শিশুরা যদি ছবি আঁকার সংগে সংগে তারা চেনা প্রাকৃতিক পরিবেশের দৃশ্য, বর্ণ এবং অবস্থান সম্বন্ধে অবহিত হ'তে শেখে, তা'হলে পরিবেশের রূপ, রস ও গন্ধে শিশুরা শুধু অনুপ্রাণিত হয়েই উঠবে না, তাদের অন্তরের 'সুন্দরম্'ও জাগ্রত হয়ে উঠবে। শুধু তাই নয়, চিত্রাংকনের সাধনায় তার পর্যবেক্ষণ নির্ভুল হবে, এবং সঠিকভাবে সেই রূপটিকে বিভিন্ন আকারের মধ্যে রূপায়িত করে তুলতে শিখবে। তা ছাড়া ছবি আঁকার প্রয়োজনীয়তাটাও শিশুরা কিছুটা উপলব্ধি করবে।

তাহলে ছবি আঁকার মধ্য দিয়ে শিশুদের আগ্রহ আর কৌতূহল মূর্ত হয়ে উঠবে। ফলে কল্পনাশক্তি জাগ্রত হয়ে উঠার সংগে সংগে তারা পরিবেশের সৌন্দর্যকে শুধু আবিষ্কার করতেই শিখবে না, গৃহ ও বহির্পরিবেশের সুসম ব্যবস্থাপনা, কার্য্যকরী সাজসজ্জা, এমন কি বস্তু বিশেষের সুঠাম আকৃতি ও বর্ণ সম্বন্ধেও তাদের একটা রুচিবোধ গড়ে উঠবে। তাই একজন শিল্পী বলেছেন যে, ছবি আঁকার মধ্য দিয়ে শিশুরা কেবল তুলিকা চালনাতেই নৈপুণ্য অর্জন করবে না, বরং 'It should also develop their inventive and imaginative

faculties, and create a taste for good form, colour, effective decoration, and harmonious arrangement in their homes and surroundings.'

সেজন্য অবশ্য দৃষ্টিকে স্বচ্ছ রাখতে হবে। শিল্পীরা তাই বলেছেন যে, যার দৃষ্টি আছে, সেই সৃষ্টি করতে পারে। ছবি আঁকার ক্ষেত্রে চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণটাই একান্ত অপরিহার্য। চোখই হচ্ছে মনের দ্বার ; কাজেই চোখের অনুশীলনের বিশেষ প্রয়োজন। হাত দিয়ে ছবি আঁকার সময় প্রত্যক্ষ বস্তুকে চিন্তার রঙে রাঙিয়ে না তুলতে পারলে জীবনের লাবণ্যে, চিন্তার স্পর্শে ছবি কখনই প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারে না। কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে, ছবি আঁকার সংগে হাত, চোখ ও মগজের কাজ সমান তালে চলে। আগেকার মানুষের ধারণা ছিল যে, ছবি আঁকাটা শুধু চিত্ত-বিনোদনের জন্য, ওর পিছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই ; কাজেই চিত্রাংকনটা শুধু নিরুদ্ধ মনের আবেগ মুক্তির জন্য। কিন্তু বর্তমান যুগে সে ধারণার রূপান্তর ঘটেছে। আজকের শিক্ষাবিদ্‌রা বলেছেন যে, ছবি আঁকার অর্থ কেবল মনকে মুক্তি দেওয়া নয়, মননশীলতাকে কাজে লাগানো। অর্থাৎ দেখার সংগে সংগে বিভিন্ন দৃষ্টিভংগী থেকে চিন্তা করতেও শেখা যায়।

ছবি আঁকার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, দেখতে শেখা। অর্থহীন শূন্য চোখে কোন বস্তুকে দেখলে চলবে না, বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে বস্তুর অভ্যন্তরের রূপটিকে আবিষ্কার করতে হবে, তা না হ'লে ছবির মধ্যে কৃত্রিমতার অক্ষম ব্যর্থতা ফুটে উঠবে। অভিজ্ঞ শিক্ষকমাত্রেই জানেন যে, অভ্যাসের দ্বারা হাতের দক্ষতা

বাড়তে পারে, কিন্তু একটু বুদ্ধি খরচ করে, কেমন ভাবে কি আঁকতে হবে, সেটা শেখানোই খুব কঠিন। আর একটা কথা, চমৎকার সমাপ্তিটাই কিন্তু আসলে ভাল ছবির লক্ষণ নয়, ভাল ছবির নিদর্শন হচ্ছে স্পষ্ট ও সুনিপুণভাবে ছবিটাকে প্রকাশ করা। কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে, দেখা নির্ভুল হ'লে প্রকাশও সঠিক হবে—অর্থাৎ, যে ছবি কোন একটি বস্তুর সামগ্রিক বর্ণনা, লিখিত রচনার মত একতরফা নয়, সে ছবির সঠিক প্রকাশ নিশ্চয় মানুষের মনকে স্পর্শ করবে। তা ছাড়া ছবির মস্ত গুণ হচ্ছে তার সর্বাত্মক প্রকাশ-ক্ষমতা। ছবির রেখাগুলো নির্জীব হলেও তার ইংগিতধর্মী ভাষা যেমন স্পষ্ট, তেমনি ব্যাপক। তাই একজন শিক্ষাবিদ্ বলেছেন, একটিমাত্র দৃশ্যই কেবল একটা গোটা গল্পের ছবি নয়—তা সহজেই অজস্র কাহিনীকে সহজ ও স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে পারে। কাজেই শিশুদের সেই স্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তির বিকাশ সাধন করাই হবে শিক্ষকদের কর্তব্য।

নির্ভুলভাবে দেখতে শেখানোই হবে শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য। কারণ দর্শন, স্মৃতি, উপলব্ধি থেকেই আর্টের জন্ম। কাজেই, দেখা ঠিক হ'লে প্রতিভাসও নির্ভুল হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেজন্য কোন বস্তুর গঠন-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার সময় ছেলেদের নিম্নলিখিত নির্দেশ দিতে হবে :—

(১) ভালভাবে বস্তুর আকৃতি লক্ষ্য কর ঃ

(২) আলো-ছায়ায় কেমন লাগছে দেখ ঃ

(৩) বস্তুটির আকৃতি কেমন—লম্বা, চওড়া, না গোল ?

(৪) নির্ভুলভাবে পর্যবেক্ষণ কর ঃ

প্রথম শ্রেণীর ছেলেদের সূক্ষ্ম কাজ করতে দেওয়া উচিত নয়। পুংখানুপুংখভাবে কোন কারুকার্য করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়, সেটা চোখের পক্ষেও ক্ষতিকর বটে। তাদের পক্ষে নির্ভুলভাবে পর্যবেক্ষণ করাটাও সম্ভব নয়। তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রদের পক্ষে সেটা খুব কঠিন হবে না। উপযুক্ত শিক্ষা পেলে, তারা কি আঁকছে ও তার গঠন কেমন—তা তারা নিশ্চয় বলতে পারবে। কাজেই সব সময় ছেলেদেরই পর্যবেক্ষণ করতে দিতে হবে, শিক্ষকের চোখে ছাত্রেরা দেখবেনা ; সেজন্য অবশ্য তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়—এমন পরিবেশের সৃষ্টি করতে হবে। কোন বস্তুর প্রতি শিশুর দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'লে শিক্ষকের কর্তব্য হবে, সেটি আঁকার জন্য তাকে অনুপ্রাণিত করা। আর দেখতে হবে—শিশুরা তাদের সাধ্যমত তাকে রূপায়িত করতে পারে কিনা। বস্তুর প্রতিফলনটা আঁকতে শিশুরা যে আনন্দ পাবে, নিছক অনুকরণের মধ্যে তার ভগ্নাংশও মিলবে না।

পর্যবেক্ষণেরও একটা মাত্রা থাকবে। যতটুকু দেখে ছেলেরা বুঝতে সক্ষম হবে, শিক্ষক মহাশয় কৌশলে সেইটুকুই পর্যবেক্ষণ করতে শেখাবেন। দেখাটা অবশ্য অংকন-ক্ষমতার একমাত্র পন্থা হবে না, দেখার সংগে অনুভূতি অর্থাৎ মগজেরও যোগ থাকবে। কারণ অংকন-প্রবণতা ও মননশীলতার মাঝে খুব বেশী ব্যবধান থাকলে গ্রহণ এবং প্রকাশের মধ্যে যে অসামঞ্জস্য আসবে, তা'তে শিক্ষার দিকটা মাটি হয়ে যেতে পারে।

কোন বস্তু সম্বন্ধে ধারণা দিতে গেলে কথার দ্বারা সেটা বুঝিয়ে দিতে হবে। কোন দৃশ্যের বর্ণনা ঠিক না হলে, স্মৃতি থেকে ছবি আঁকার সময় ছেলেরা মুস্কিলে পড়ে। কাজেই, কোন কিছু ছেলেদের আঁকতে বলে লক্ষ্য করে দেখতে হবে যে, তাদের নির্বাচনে কোন্ ছবিটা ধরা পড়েছে। বিষয়টা তারা ঠিক বুঝতে পারছে কি না, সেটা পরখ করবার জন্যেই যে তা লক্ষ্য করতে হবে এমন নয়; তবে দেখতে হবে ব্যাখ্যার দোষে কোন ভুল ধারণা তাদের মনে জন্মেছে কিনা। যেমন—কখনও বলা উচিত নয় যে, এই যে ব্ল্যাকবোর্ড দেখছ, এটা ঠিক চৌক, কিংবা কমলালেবুর মত গোলাকার, বা—ঠিক বৃত্তের মত। ঐ ধরনের কথা না বলে, বস্তুগুলির সঠিক বর্ণনা দেওয়াই উচিত।

ব্যাখ্যার দ্বারা বোঝানো সম্ভব না হ'লে আসল বস্তুটিকে শিশুর সামনে তুলে ধরতে হবে। প্রমাণযোগ্য প্রত্যক্ষ রূপটিকে দেখে শিশুরা ছবি আঁকবে। এই বস্তুর রূপটিকে (ভাল মন্দ যা-ই হোক) ফুটিয়ে তোলাটাই হবে চিত্রাংকনের উদ্দেশ্য। বস্তুর আকৃতির প্রভাব আছে ব্যক্তি-চরিত্রে। ব্যক্তিগত দৃষ্টিভংগীর উপরে বস্তুর গঠনবৈশিষ্ট্যের ভাল-মন্দ নির্ভর করে অনেকখানি। আবার, অতি পরিচিতির দরুণ ক্ষেত্রবিশেষে বস্তুবিশেষের প্রতি বিতৃষ্ণা জাগাটাই স্বাভাবিক; তখন সেই বস্তুর ছবি আঁকতে গেলে কখনই তা ভাল হ'তে পারে না। কারণ শিশুমনে বস্তুর আকৃতির প্রভাব বড় কম নয়।

কাজেই পরিবেশের মধ্যে এমন সৌন্দর্যের আমদানি করতে হ'বে, যা শিশুকে মুগ্ধ, আকৃষ্ট করবে। সেই আকর্ষণের তাগিদে শিশু ছবি আঁকতে শুরু করবে। শিশুদের সেই সৌন্দর্য-প্রবণতার কথা উল্লেখ করে একজন শিক্ষাবিদ্ বলেছেন যে, শিশু মাত্রই যখন ছবি আঁকতে ভালবাসে, তখন চিত্রাংকন-পদ্ধতির প্রধান কথা হবে সৌন্দর্য সম্বন্ধে শিশুদের সচেতন করে তোলা। শিশুদের শিল্প-শিক্ষা দিতে হলে, প্রথমেই জানতে হবে যে, কখন কোন্ পদ্ধতি প্রয়োগ করাটা কেবল বাঞ্ছনীয় নয়, শশুদের পক্ষে কার্য্যকরী ও উপযোগী হবে। তবে একথা ঠিক যে, কেবল ডায়গ্রাম আর কারুশিল্প থেকে ছেলেদের অনুকরণ করতে শেখালে, শিশু-শিল্পের উদ্দেশ্য অর্থহীন হয়ে পড়বে। কারণ অনুকরণের মধ্যে প্রয়োগ ও অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ ; সেখানে কল্পনার কোন স্থান নেই। কাজেই অনুশীলনের সময় সেখানে হাতের সংগে চোখ কেবল সায় দেয়, মন কিন্তু থাকে নিশ্চুপ হয়ে। ফলে বাস্তব সত্য এবং সৌন্দর্য আনন্দের পসরা নিয়ে মনের দরবারে হাজির হতে পারে না। এই কারণে তথাকথিত 'ফ্রি হ্যাণ্ড ড্রয়িং'-এর মধ্যে বিশেষ করে দুটো জিনিষের অভাব ঘটে। প্রথমটি হচ্ছে সুষ্ঠু মৌলিক ধারণার অভাব, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে সৃজনাত্মক আনন্দের অভাব।

এর পরেই আসে শ্রেণী পরিচালনার কথা। তার আগেই অবশ্য সরঞ্জামের কথা উঠে। চিত্রাংকন পদ্ধতির ব্যবহারিক প্রয়োগটা বুঝিয়ে বলার জন্য প্রয়োজন একটা ব্ল্যাকবোর্ডের।

তা না হলে শিক্ষক মহাশয় কখনই একই সংগে ছবি আঁকার পদ্ধতি ও প্রয়োগকে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারেন না। বুঝানোর নামে শিক্ষক মহাশয় যেন ছবির সবটুকু এঁকে না দেন; কোন একটি নক্সা বা স্কেচ্ কেমন ভাবে আঁকতে হবে, সেই পদ্ধতির খেইটুকু ধরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু তিনি তা' না করে যদি কোন রকমে গোটা ছবিটাকে বোর্ডে এঁকে দিয়ে চুপ করে চেয়ারে বসে থাকেন, আর ছেলেদের সেটাই অনুকরণ করতে বলেন, তাহলে চিত্রাংকনের উদ্দেশ্য শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হবে। ছেলেরা আঁকতে আরম্ভ করলেই, শিক্ষককের কাজ আরম্ভ হবে। তিনি তখন ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেকটি শিশুর কাছে যাবেন এবং প্রয়োজন হলে তাদের ছবি সংশোধন করে দেবেন। সে সময়টা কোন মতেই বসে থাকাটা উচিত হবে না। বরং প্রয়োজন হলে একটি ভাল 'মডেল' ছেলেদের সামনে তুলে ধরবেন। 'মডেল' থেকে ছেলেদের কিছু আঁকতে দেওয়ার সময় শ্রেণী-ব্যবস্থার (Class arrangement) দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। ছেলেদের এমন ভাবে বসাতে হবে, যাতে প্রত্যেকটি ছেলে তার আসনে বসে ঠিক মত 'মডেলটিকে' দেখতে পায়। কোন কারণে কারুর যাতে দেখার কোন ব্যাঘাত না ঘটে, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

'মডেল' থেকে আঁকার সময় শিক্ষক মহাশয়কে বলে দিতে হবে যে, 'মডেলের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য কি (Peculiarities), তার গঠন সমতা কোথায় কতটু (Proportion) আছে, তা না হলে ছেলেরা ছবিটা ঠিক

মত আঁকতে পারবে না। গঠন বৈশিষ্ট্যটুকু বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি ইচ্ছা করলে অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে তার তুলনা করে বুঝিয়ে বলতে পারেন। এ ক্ষেত্রে ছেলেরা ঘাড় নাড়লেই শিক্ষককের কর্তব্য শেষ হবে না, জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে হবে, তারা ঠিকমত বুঝতে পারলো কিনা।

সহজ থেকে ক্রমে ক্রমে অপেক্ষাকৃত কঠিন বস্তু তাদের আঁকতে দিতে হবে। ছবি আঁকার দক্ষতা অর্জন করবার আগেই যদি কোন ছেলেকে খুব কঠিন ছবি আঁকতে দেওয়া হয়, তা হ'লে শিশুর চোখের উপর কেবল অযথা জোর পড়বে না, ছবি আঁকার প্রতি তার একটা বিতৃষ্ণা জন্মাতে পারে। সেইজন্যে সহজ থেকে ধাপে ধাপে ছেলেদের কঠিনের দিকে নিয়ে যেতে হবে। ছেলেদের সামনে উপস্থাপিত কোন মডেল যদি কঠিন হয়, আঁকতে গিয়ে প্রত্যেকটি ছেলেই যদি ঠিক আঁকতে না পারে, তা হলে শিক্ষক মহাশয় large scale sketch-এ ছেলেদের তা দেখিয়ে দিতে পারেন। তবে সেই সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, শিশুরা যাতে পরস্পরে দেখাদেখি না করে। প্রত্যেককে নিজের চোখ দিয়ে দেখে, নিজের হাতে আঁকতে দিতে হবে। তা হলে ব্যক্তিগত ভাবে তারা যে সমস্যার সম্মুখীন হবে, তার সমাধান করে দিতে পারলেই ছেলেদের মস্ত উপকার করা হবে।

আর একটা কথা, পাঁচ থেকে দশ মিনিটে শিক্ষক যে ছবি আঁকতে পারেন, ছেলেরা তা আধ ঘণ্টায় আঁকতে বা সংশোধন করতে পারবে কিনা সন্দেহ। কাজেই ছেলেদের

ছবি আঁকার জন্যে বেশ কিছু সময় দিতে হবে। যা-ই তারা আঁকুক না কেন, সব সময় দেখতে হবে, তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে স্পষ্ট অথচ সুন্দর রেখায় ছবিটিকে রূপায়িত করতে পারছে কিনা। পর্যবেক্ষণ, নির্বাচন ও বিচারের দায়িত্ব তাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলে চলবে না, মাঝে মাঝে তদারক করে তাদের উৎসাহিত করতে হবে। এই পদ্ধতিতে নির্দেশ দিয়ে সংশোধন করে দিলে চিত্রকলার শ্রেণীতে ছেলেদের মাঝে আসবে উদ্দীপনা; এবং সেই সংগে দ্রুত তালে চলবে তাদের প্রগতি ও উন্নতি।

———

যে যে বই-এর সাহায্য নিয়েছি—

১। টু ইয়ারস্ ইন্ ইন্‌ফ্যাণ্ট স্কুল ··· ঈ-ব্লাইটন
২। স্কুল মেথড্ ··· এফ-জি-গ্রাগুম্যান
৩। দি হ্যাণ্ডিক্যাপ্‌ট্ চাইল্ড ··· ওয়াড়িয়া সম্পাদিত
৪। এডুকেশন থ্রু এক্সপিরিয়েন্স ··· ঈ-মেলার
৫। লার্নিং এ্যাণ্ড টিচিং ইন্ ইনফ্যাণ্ট স্কুল··· ওয়েলফ
৬। সেভেন টু ইলেভেন ··· রাইমণ্ট
৭। য়্যাক্টিভিটি ইন্ প্রাইমারী স্কুল··· উড্‌ফোর্ড
৮। টিচিং ইন্ স্মল স্কুল ··· এম-ভি-ডানিয়েল
৯। ক্রিয়েটিভ এডুকেশন ··· রাইবার্ণন্
১০। লাইফ্ ইন্ দি নার্সারী স্কুল ··· এল-ভি-লিসা
১১। অঙ্ক-শিক্ষণ-পদ্ধতি ··· প্রফুল্ল বিশ্বাস
১২। স্পিচ্ ইন্ এডুকেশন ··· ব্যাকুস্
১৩। ছোটদের লেখাপড়া ··· শিশুলালনী গ্রন্থমালা
১৪। আপনার শিশু কি লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়ে ? ঐ
১৫। মেথড্ অফ্ টিচিং ম্যাথামেটিকস্··· ইয়াং
১৬। চাইল্ড আর্ট ··· ভায়েলা
